সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

কর্মযোগী শ্রীকান্ত যোশীর জীবনাবসান □ ৯

ভাঙড়-এর কায়দায় কি পঞ্চায়েত দখল হবে? □ ১০

নেতাজী ও রাশিয়া □ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত □ ১১

সংস্কার কোন্ পথে □ অম্লানকুসুম ঘোষ □ ১৩

কোম্পানী বিল, ফেমা সংশোধনী বিল, ব্যাঙ্ক সংশোধনী বিল পাশ ও সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা □ এন সি দে □ ১৬

গান্ধর্বী □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

পৌরাণিক নগর উজ্জয়িনী □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২৩

খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়লেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে □ ভরত ঝুনঝুনওয়ালা □ ২৮

মালদার বিভিন্ন গ্রামে 'লাভ জেহাদ' চলছে □ ৩০

মরিচঝাঁপি গণহত্যার ঘোষিত তদন্তাদেশের বিলম্ব মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত হানছে □ অসিতবরণ ঠাকুর □ ৩১

খোলা চিঠি : নাটক শুরু হয়ে গেছে, সবাই মোবাইল বন্ধ করুন □ সুন্দর মৌলিক □ ৩৪

স্মরণে : তোমার সুরে গাহি আজও গান □ তুষারকান্তি ঘোষ □ ৩৬

থিয়েটার কমিউনের নাটক 'জাগ্রত বিবেক' □ বিকাশ ভট্টাচার্য □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ বোধন : ২১ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ অঙ্গনা : ২৬-২৭ □ □ অন্যরকম : ৩৩ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৮ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

সংস্কার কোন্ পথে?

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ৭ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২১ জানুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

স্বস্তিকা
বিবেকানন্দ যুব শিবির সংখ্যা

প্রকাশিত হবে
২৮ জানুয়ারি
২০১৩

সদ্যসমাপ্ত ১১, ১২, ১৩ জানুয়ারী কল্যাণীর গয়েশপুর গোশালা ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত আয়োজিত বিবেকানন্দ যুব শিবিরের বহু তথ্যসমৃদ্ধ স্বস্তিকা-র বিশেষ সংখ্যাটি আগামী ২৮শে জানুয়ীর প্রকাশিত হতে চলেছে। সম্পূর্ণ রঙীন আকারে।

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ— জি. মাধবন নায়ারের সাক্ষাৎকার, সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের ভাষণ, প্রতিটি কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন, পাতায় পাতায় রঙিন ছবি, বিশেষ বিশেষ মূহুর্ত ও আরও অনেক কিছু।

অতি সত্বর নিজ নিজ জেলা থেকে আনুমানিক স্বস্তিকা-র সংখ্যা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

।। সত্বর কপি বুক করুন।। মূল্য ১০ টাকা।।

HB ®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS

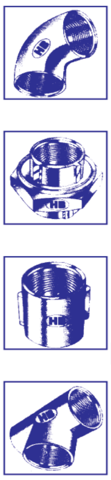

HB ®
AN ISO 9002
CERTIFIED CO.

Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

বিষাক্ত শিশুমন

দিল্লী ধর্ষণ কাণ্ডে মেয়ের ধর্ষণ ও মৃত্যুর জন্য অভিযুক্ত নাবালকের ফাঁসির দাবি জানাইয়াছেন নিগৃহীতা ছাত্রীর মা। তাঁহার প্রশ্ন যে 'পশুটি মেয়েটাকে শুধু ধর্ষণ করিয়াই থামে নাই, লোহার রড দিয়া পাকস্থলি টেনে বাহির করিয়াছে আর আইনের চোখে ওই না কি নাবালক!' কেবল নাবালকত্বের কারণে গণধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্ত এক দুষ্কৃতিকে জুভেনাইল কোর্টে বিচারের সিদ্ধান্ত লইয়াছে আদালত। বিচারে দোষী প্রমাণিত হইলে বড়জোর তিন বছরের জন্য জুভেনাইল হোমে থাকার শাস্তি হইবে। কিন্তু এই অপরাধ কি ক্ষমার যোগ্য? সাম্প্রতিক সমীক্ষা বলিতেছে ২০১১ সালে ৩৩ হাজারেরও বেশি নাবালককে ধর্ষণ ও হত্যার মতো ভয়ঙ্কর অপরাধের জন্য গ্রেফতার করা হইয়াছে। এদের মধ্যে ২১,৬৫৭ জনের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে আর ১২১১ জনের বয়স ৭ থেকে ১২ বছরের মধ্যে। তথ্য বলিতেছে ২০০১ সালে ৩৩,৬২৮ জন নাবালক অপরাধী ধরা পড়িয়াছে। ২০০২ সালে তাহা দাঁড়ায় ৩৫,৭৭৯ জন। ইহার পর ২০০৩ সালে ৩৩,৩২০ জন। ২০০৪ সালে ৩২,৬৮১ এবং ২০০৫ সালে ৩২,৬৬১ জন। ২০০৬ সালে নাবালক অপরাধীর সংখ্যা ৩২.১৪৫ জন আর ২০০৭ সালে ৩৪,৫২৭ জন। ২০০৮ সালে ৩৪,৫০৭ জন এবং ২০০৯ সালে ৩৩,৬৪২ জন। ২০১০ সালে এই সংখ্যাটি দাঁড়াইয়াছে ৩০,৩০৩ জনে। রেকর্ড জানাইতেছে ২০১১ সালে কেবল নাবালক ধর্ষকের সংখ্যা ১৪১৯। ২০০১ সালে যাহা ছিল মাত্র ৩৯৯ জন। মাত্র ১০ বছরে কেন এই পরিবর্তন? পাশ্চাত্য ভোগবাদকে সমর্থনের কুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইউরোপ আমেরিকার মতো আরও অনেক কেচ্ছা ঘটিলেও অবাক হইবার কিছু থাকিবে না।

শিশুর নৈতিক চরিত্র বাবা, মা, দাদু, ঠাকুমা, ভাই, বোন ইত্যাদির প্রভাবে গড়িয়া উঠে। সমীক্ষা বলিতেছে, প্রায় শতকরা নব্বই জন বদ-ছেলেদের আত্মীয়েরা কেহ না কেহ কয়েদী ছিল। যাঁহারা এই সমস্যা লইয়া গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহারা সবাই দেখিয়াছেন যে পরিবার খারাপ হইলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে শিশুমন বিকৃত হইয়া পড়ে। বাবা মায়ের ভিতর যদি দিনরাত ঝগড়া চলিতে থাকে শিশুদের যদি কেহ স্নেহ করিবার না থাকে তবে শিশুমন বিকৃত হয়। শিশুকে মানুষ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা অথবা সোনাদানার প্রয়োজন নাই। দরকার শুধু বাবা-মার শিশুর প্রতি যত্ন লওয়া। কেবলমাত্র পরিবারের সুপরিচালনার অভাবে শিশুরা নষ্ট হইয়া যায় এবং বড় হইয়া সমাজ ও জাতির সর্বনাশ করে। আদব কায়দা, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ইত্যাদি ছেলেবেলা হইতেই শিখাইতে হয়। অনেকেই ভাবিয়া থাকেন শিশু বড় হইলে নিজেরাই ভদ্র সভ্য বনিয়া যাইবে। কিন্তু শিশুরা কোনটা শিষ্টতা আর কোনটা অশিষ্টতা তাহা কিছুই জানে না। যাহা দেখিয়া থাকে তাহাই শিখে। বাবা গালাগালি দিলেন, শিশু কৌতূহলের সহিত শুনিল। পরে সেই শব্দটিই বাবার প্রতি ব্যবহার করিল। দূরদর্শনের চিত্র দেখিয়া শিশুরা বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অনুসরণ করিতে গিয়া নিজেদের বিপদই ঘটাইয়াছে। আজ দূরদর্শনের প্রভাবেও হিংসা, হানাহানি, যৌনতা শিশুমনে স্থান করিয়া লইয়াছে। অভিভাবকদের এবিষয়ে নিজেদেরই সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুদের বিবেক শৈশবেই গড়িয়া উঠে। আমরা দেখিতে পাই প্রথমে যেসব নীতিমূলক কথা বাবা মায়েরা দাদা দিদি শিশুকে বলিয়া থাকেন তাহা শিশুর মনে এমন ভাবে গ্রথিত হইয়া যায়, তখন শিশুরা নিজেরাই যেন নিজেদের নৈতিক শিক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। ভালো শিক্ষা ও পরিচালনার ফলে শিশুদের ভালোমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা বাড়িয়া যায় এবং নীতিজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরে নৈতিক আদর্শের জন্যই তাহারা সর্বপ্রকার কষ্টবরণ করে এবং সমাজের উন্নতি সাধন করিতে পারে। বিবেকানন্দ যুব শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এইজন্যই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ মোহনরাও ভাগবতজী আমাদের চরিত্র শুদ্ধির ডাক দিয়েছেন। সহ-সরকার্যবাহ সুরেশজী যোশী আদর্শ পরিবারের উল্লেখ করিয়াছেন। আর আদর্শ চরিত্র গঠন করিবার পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যে আদর্শ স্থান তাহাও আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি হইতেছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

হিন্দু বলেছেন কি যে, রাজনৈতিক সামাজিক স্বাধীনতা—বেশ কথা, কিন্তু আসল জিনিস হচ্ছে পারমার্থিক স্বাধীনতা— 'মুক্তি'। এইটিই জাতীয় জীবনোদ্দেশ্য; বৈদিক বল, জৈন বল, বৌদ্ধ বল, অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত বা দ্বৈত যা কিছু বলো, সব ওইখানে এক মত।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

শিলিগুড়িতে স্বামীজীর জন্মসার্ধশতবর্ষে বিশাল শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারি সারি বিবেকানন্দ বাঘাযতীন পার্কে দাঁড়িয়ে। কারও কারও পাগড়িটা একটু নড়ে-চড়ে যাচ্ছে। মা আবার ঠিক ঠাক করেদিচ্ছিলেন। সবে শোভাযাত্রা শেষ হয়েছে। অন্যরাও দাঁড়িয়ে। —স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে শিলিগুড়িতে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মসার্ধশতবর্ষ আয়োজন সমিতির উদ্যোগে এদিন তিনটি শোভাযাত্রা তিনদিক থেকে (পানিট্যাঙ্কি মোড়, রথখোলা ময়দান, দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব) এসে এদিন সকাল পৌনে দশটায় বাঘাযতীন পার্কে পূর্ব পরিকল্পনা মতো একত্রিত হয়। শোভাযাত্রার ব্যবস্থাদি দেখছিলেন— কমলেশ সরকার, অনিরুদ্ধ দাস, অমরকৃষ্ণ ভদ্র, হিতেন চক্রবর্তী এবং স্বরূপা রায় সহ অনেকে। শিশুরা স্বামীজী, মা সারদা, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস সেজেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকটি শিশুমন্দিরের বালক-বালিকারাও ছিল। কয়েকটি শিশুমন্দিরের বালক- বালিকারা ঘোষবাদ্য সহ যোগ দিয়েছিল। তবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যারা বিবেকানন্দ সেজে এসেছিল তারা। মাইকে, গান বাজছিল— ভুবনমণ্ডলে নবযুগম্ উদয়তু সদা বিবেকানন্দময়ম্...। তার সঙ্গে মাইকে প্রচার করা হচ্ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বাণী। সব মিলিয়ে একটা বিবেকানন্দময় পরিবেশ। আয়োজন সমিতির আহ্বানে নেতাজী বালিকা বিদ্যালয় এবং বরদাকান্ত হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও এই শোভাযাত্রায় সামিল হয়েছিল। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শহর এদিন ছিল বিবেকানন্দময়। স্বামী বিবেকানন্দ জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন সমিতির উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের মালদহ, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, জলপাইগুড়ি, নকশালবাড়ি, পুন্ডিবাড়ি, মাথাভাঙ্গা , আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, জয়গাঁ, ধূপগুড়ি, আমবাড়ি, কালিয়াগঞ্জ, বুনিয়াদপুর প্রভৃতি স্থানে শোভাযাত্রা (বিভিন্ন ট্যাবলো সহ), সাইকেল শোভাযাত্রা, মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা, গ্রাম পরিক্রমা প্রভৃতির মাধ্যমে বর্ষব্যাপী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুভারম্ভ হয়।

সিকিমের জোড়থাং ও গ্যাংটকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে সেখানে জেলা, মহকুমার ও ব্লক পর্যায়ে সার্ধশতবর্ষ পালনের জন্য সমিতি গঠিত হয়েছে।

শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে শোভাযাত্রা সম্মিলিত হওয়ার পর বক্তব্য রাখেন প্রদেশ সমিতির সদস্য এবং বিবেকানন্দ গবেষক শ্রীজীব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানান অধ্যাপক সত্যপদ পাল।

ধর্ষণকারীদের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে মাইনোরিটি কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারা দেশে যখন ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের দাবি উঠছে তখন ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনোরিটিস (এন সি এম) তার বিরোধিতা করছে। কমিশনের বক্তব্য, এইরকম পূর্বনির্ধারিত শর্ত (Blanket provision) আরোপ করলে তা ধর্ষিতাদের খুন করতে ধর্ষণকারীদের প্ররোচিত করবে। দিল্লীর গণধর্ষণের ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় দেশ জুড়ে যে ধর্ষকদের খোজা (castration) এবং প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার দাবি উঠেছে সে বিষয়েও বিচারপতি ভার্মা কমিশনকে প্রদত্ত সুপারিশে এন সি এম চেয়ারপারসন ওয়াজেহাদ হবিবুল্লাহ সতর্ক করে দিয়েছেন। কমিশনের বক্তব্য— ধর্ষণ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে ধর্ষণকারীদের শাস্তি বাড়িয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সেইসঙ্গে অর্থদণ্ড ধার্য করা যেতে পারে। এই আইনে মৃত্যুদণ্ডের শর্ত আরোপ করলে তা ধর্ষিতার জীবন বিপন্ন করতে পারে। গত ৫ জানুয়ারি কমিশন তাদের সুপারিশে ধর্ষণের সংজ্ঞা সংশোধন করে যৌন অত্যাচার (সেক্সসুয়াল অ্যাসাল্ট) হিসেবে চিহ্নিত করতে বলেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলিমদের) সঙ্গে যুক্ত অপরাধের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে একটি পথ নির্দেশ যাতে দেওয়া হয় এই মর্মে প্রেস কাউন্সিলকে অনুরোধ জানিয়েছে এন সি এম।

সঙ্ঘের উদ্যোগে স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে কল্যাণীতে বিবেকানন্দ যুব-শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১-১৩ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম- সার্ধশতবর্ষ পূর্তি ও বাংলায় সঙ্ঘকাজের ৭৫ বছর উপলক্ষে কল্যাণীর কাছে গয়েশপুর গোশালা ময়দানে আয়োজিত হলো বিবেকানন্দ যুব শিবির। শিবিরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ১০,০০০ যুবক স্বয়ংসেবক যোগদান করেন। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে, অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ভাগাইয়াজী ও শারীরিক প্রমুখ অনিল ওক সহ আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র ও দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সকল অধিকারীরা এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। ১১ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং ১৩ তারিখ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যথাক্রমে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দ ও বেলুড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ শিবিরার্থীদের আশীর্বচন দেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসরোর ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জি মাধবন নায়ার। যুবশিবির উপলক্ষে গঠিত স্বাগত সমিতির সভাপতি হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় তিনদিনই শিবিরে অবস্থান করেছিলেন। শিবিরের মূল প্রবেশদ্বার নির্মিত হয়েছিল বেলুড় মঠের আদলে, মূল মঞ্চ নির্মিত হয়েছিল বিবেকানন্দ-কেন্দ্র কন্যাকুমারীর অনুকরণে এবং প্রদর্শনী স্বামীজীর সিমলার পৈতৃক ভিটের অনুসরণে। শিবিরে উপস্থিত ১০,০০০ যুবকের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁবুতে। জেলা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ১১ জন শিষ্যের নামে নামাঙ্কিত ১১টি নগরে বিভক্ত করে শিবিরার্থীদের তাঁবুগুলো নির্মিত হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত নগরের তাঁবুগুলিতে ছিলেন সঙ্ঘের অধিকারীরা। এছাড়াও প্রায় হাজার তিনেক প্রবন্ধকও থাকতেন বিভিন্ন নগরের তাঁবুতে। শিবিরে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত কবাডি খেলোয়াড় বিশ্বজিৎ পালিত ও 'চাণক্য'-সিরিয়াল খ্যাত অভিনেতা চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী উপস্থিত ছিলেন। শ্রী দ্বিবেদী শিবির-স্মরণিকা 'অভীঃ'র আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন।

মঞ্চে বক্তব্যরত মোহনরাও ভাগবত। বসে অন্যরা।

শিবির শুরুর আগের দিন অর্থাৎ ১০ জানুয়ারি দ্বারোদঘাটন হয় শিবিরের প্রদর্শনীর। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বিশ্বময়ানন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলন গবেষিকা বন্দিতা ভট্টাচার্য, নেতাজী গবেষিকা পূরবী রায়, মহুয়া ধর, সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্তপ্রমুখ। তাঁর ভাষণে শ্রীভাগবত বলেন, "স্বামীজীর বাণী শুধু তাঁর মুখ-নিঃসৃত ক'টি মাত্র শব্দ নয়। সেই শব্দ তিনি নিজের জীবন দিয়ে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই তাতে শক্তি ছিল। একারণেই স্বামীজীর বাণী আমাদের জীবনাদর্শ। একে বাস্তবে পরিণত করার দায়িত্ব সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদেরই নিতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "ভারতকে মহাশক্তিধর হতে হবে। তবে এর মানে এই নয় যে আমেরিকা কিংবা চীনের মতো সর্বগ্রাসী শক্তি হতে হবে। সারা বিশ্বকে মনুষ্যত্বের আদর্শে দীক্ষিত করতে তাকে শক্তিশালী হতে হবে।" 'উপস্থিত সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাই' কথাক'টি বাংলায় বলে সকলের মন ছুঁয়ে যাওয়া ভাষণে মাধবন নায়ার স্বামীজীর চিকাগো বিজয়ের গৌরবগাথা থেকে উপস্থিত যুবকদের প্রেরণা নেবার পরামর্শ দেন। স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ বলেন, স্বামীজীর আস্থা ছিল যুবকদের ওপর। তাঁর স্বপ্ন সফল করার দায়িত্ব যুবকদেরই নিতে হবে। স্পষ্টতই তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিলেন যুব-শিবিরে উপস্থিত যুবকেরা। এছাড়াও শিবিরের বক্তব্য রাখেন ভাইয়াজী যোশী, দত্তাত্রেয় হোসবালে, বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কন্যাকুমারীর সহসঞ্চালিকা নিবেদিতা ভীড়ে, প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত, সত্যনারায়ণ মজুমদার, ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য, স্বামী ঋতানন্দ, অতুল বিশ্বাস প্রমুখ।

উপকারের নামে এন জি ও-রা দেশবিরোধী কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগে অনেকে যখন কিছু করে দেখাতে চাইতেন তখন তাঁদের ঝোঁক ছিল একটা কাগজ বের করে কলমের শক্তি প্রদর্শন। এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে, কাগজ বের করা নয়, এন জি ও খুললে ভালো দাপট দেখানো যায়। আর এন জি ও পত্তন করা কোনও কঠিন কাজ নয়, সেইসঙ্গে আবার আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ মর্যাদা মেলে। এমনকী ভারত সরকারের উপদেষ্টা সোনিয়া গান্ধীর যে ন্যাশনাল অ্যাডভাইসারি কমিটি রয়েছে তার অধিকাংশ সদস্যই কোনও না কোনও বেসরকারি সংস্থার (এন জি ও) সঙ্গে যুক্ত।

আরও অনেক বেসরকারি সংস্থা রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ছড়িয়েছে। সংস্থার প্রধানদের মদত দেওয়ার জন্যে প্রচুর টাকা আসছে বিদেশ থেকে। টাকার জোর থাকলে অনেক ক্ষেত্রে শক্তি প্রদর্শন সম্ভব। এইসব এন জি ও-র দুটো ভূমিকা। সামনে একধরনের উদ্দেশ্যমূলক কাজ চলে। অন্যদিকে থাকে গোপন উদ্দেশ্য। একটি বেসরকারি জনকল্যাণ সংস্থা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ডলার পেয়েছে চাঁদা হিসেবে। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের টাকা জনকল্যাণে ব্যবহারের জন্যে নিয়ে তার অপব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে কিছু সংস্থার বিরুদ্ধে। এ ধরনের অভিযোগ যখন প্রচারের মধ্যে আসে তখন এন জি ও কর্তারা সাফাই গান— আমি সৎ, অন্যরা অসৎ।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী দেশের সব থেকে বড় এন জি ও-কে অর্থ দিয়েছেন এমন পনেরোজনের মধ্যে সাতজন আমেরিকা ও ইউরোপের অধিবাসী। যাঁরা ২০০৯-১০ সালে ভারতের এন জি ও-কে ১০ হাজার কোটি টাকা চাঁদা দিয়েছে। সহজেই বোঝা যায়, এত টাকা চাঁদা শুধু সমাজসেবার জন্যে মিলছে না। এর পিছনে কিছু প্রকাশ্য আর কিছু গোপন উদ্দেশ্য থাকে। এমনকি হিংসা ছড়ানোর জন্যে সন্ত্রাসবাদীদের মদত দিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়। বিদেশিরা চায় বিদেশ থেকে টাকা নিয়ে ধর্মান্তর করা, মাওবাদীদের মদত দেওয়া, শিক্ষার ক্ষেত্রেও সমাজে পশ্চিমী আদব-কায়দা প্রচারে ব্যবহৃত হোক। কিন্তু পরমাণুক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে যাক সেটা আমেরিকা আর ফ্রান্স চায় না। নানারকম ভাবে বাধা দেওয়ার জন্যে বিদেশ থেকে টাকা আসে। জনস্বার্থের নাম করে নানারকম মতলবী কাণ্ডের ছক তৈরি হয়। পিছনে থাকে এন জি ও। এই এন জি ও-গুলো একইসঙ্গে সুবিধে ভোগ করছে, অন্যদিকে চোখ রাঙাচ্ছে। অনেক এন জি ও দেশবিরোধী কাজে যুক্ত— এ অভিযোগ এসেছে প্রকাশ্যে।

ভারতে গত বছর পর্যন্ত ৬৮ হাজার এন জি ও নথিভুক্ত। দেশের স্বরাষ্ট্র সচিব বলেছেন, এন জি ও-গুলো বিভিন্ন দেশ থেকে যেভাবে বিপুল পরিমাণ টাকাকড়ি পাচ্ছে তার কোনও হিসেবপত্র ঠিক নেই। কোন কাজের জন্যে কতটা অর্থ এলো তা লিখিত হিসেব থাকছে না।

জানা গেছে ২০০১ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বিভিন্ন এন জি ও যে টাকা পেয়েছে বিদেশ থেকে তার পরিমাণ ৭০ হাজার কোটি টাকা। সরকারি হিসেবে মিলছে ২০০৯-১০ সালেই পেয়েছে ১০,৩৩৮ কোটি টাকা। সবথেকে বেশি টাকা পায় ওয়ার্ল্ড ভিসন নামে সংস্থা। যাদের মূল কাজ ধর্মান্তর করা। আর বিপদের দিনে অনাথ আর শিশুদের সাহায্যের নাম করে খৃস্টান করা। প্রশ্ন উঠেছে, আমাদের দেশে জনহিতৈষীর ছদ্মবেশে যেসব এন জি ও বিদেশি অর্থ নিয়ে নানারকম দেশবিরোধী কাজে যুক্ত তাদের চিহ্নিত করা এবং বাড়বাড়ন্ত প্রভাব রোখা সম্ভব হবে কি?

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন

দোষী সাংসদের রেহাই কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অবস্থা এমনই যে সরকার বিষয়টা এড়িয়ে যেতে চাইলেও আর তা পারছে না। লোকসভার ৫৪৫ জন সাংসদের মধ্যে ২৭৪ জনই ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত। সম্প্রতি দেশের শীর্ষ আদালত এইসব দোষী সাংসদ ও বিধায়কদের আইন তৈরির বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। একটি জনস্বার্থ মামলার ইস্যু প্রসঙ্গে বিচারপতি এ কে পট্টনায়েক ও জ্ঞান সাধু মিশ্র-র বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছেন, সংসদ কি নিজের সদস্যদের জন্য একরকম আইন ও দেশের সাধারণ মানুষের জন্য অন্যরকম আইন তৈরি করতে পারে কি? জনপ্রতিনিধিত্ব আইন— ১৯৫১-র ৮ (৪) ধারা অনুসারে যখন একজন সাংসদ বা বিধায়ক রেহাই পাচ্ছেন, তখন একই ধরনের অপরাধে একজন সাধারণ নাগরিককে কেন শাস্তি দেওয়া হচ্ছে?

বেঞ্চ বলেছেন, আমরা মনে করি দেশের মানুষ কি চায় তা সংসদ জানে। সংসদের আইন তৈরির ক্ষমতা আছে কিন্তু এই ক্ষমতা সংবিধান সাপেক্ষ। একজন সাধারণ মানুষ যদি এই সুযোগ না পায় তবে একজন সাংসদ কেন বিশেষ শ্রেণী হিসেবে গণ্য হবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে শাস্তি দেওয়া যাবে না যতক্ষণ তার বিরুদ্ধে শাস্তির নির্দেশ সংরক্ষিত থাকবে।

কর্মযোগী শ্রীকান্ত যোশীর জীবনাবসান

চলে গেলেন সর্বজনপ্রিয় সদাহাস্যমুখ সমাজসেবী শ্রীকান্ত শঙ্কর জোশী। তিনি ছিলেন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদসংস্থার প্রাণপুরুষ। স্বপ্ন দেখতেন এবং আমাদের দেখাতেন এই সংবাদসংস্থা এক দশকের মধ্যেই নিশ্চিতভাবেই ভারতের এক নম্বর হবে। স্বপ্ন পূরণের জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রমও করেছেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে অবিরাম ছুটে বেড়িয়েছেন। বয়স হয়েছিল। নানারকম শারীরিক সমস্যাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু প্রাণশক্তি ছিল অফুরন্ত। শ্রীকান্তজীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে। এই সময়ে একবার কঠিন এক রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘ সময় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ি। মনে আছে, তিনি কলকাতায় এলেই তাঁর ব্যস্ত কর্মসূচী থেকে সময় বার করে আমাকে দেখতে আসতেন। বলতেন, রোগভোগ মানুষের জীবনে ঘটেই থাকে। তবে রোগের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে হবে। এবং সেই লড়াই জিততে হবে। শ্রীকান্তজীর কথা মনে ভরসা যুগিয়েছিল। আমি সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরেছিলাম। এমন সুন্দর মানুষটি কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ৮ জানুয়ারি মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় মুম্বাইতে সঙ্ঘের কার্যালয়ে 'হার্ট অ্যাটাকে' প্রয়াত হলেন। মৃত্যুর দিন দশেক আগে এলাহাবাদে সমাচারের কেন্দ্র অধিকর্তাদের সঙ্গে বাৎসরিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে হিন্দুস্থান সমাচার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করে বন্ধ হয়ে থাকা হিন্দুস্থান সমাচারের মাথায় একজন 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' বসিয়ে দেন। উদ্দেশ্য ছিল সংস্থার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নিলামে তোলা। যাতে হিন্দুস্থান সমাচারের পুনর্জন্ম না ঘটে। ইন্দিরা জানতেন যে সঙ্ঘে এমন অনেক কর্মযোগী সমাজসেবী স্বয়ংসেবক আছেন যাঁরা অসম্ভবকে অনায়াসে সম্ভব করতে পারেন। ইন্দিরা গান্ধীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান বন্ধ হয়ে যাওয়া হিন্দুস্থান সমাচারের প্রাক্তন কর্মী চন্দ্রমোহন ভরদ্বাজ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেন। তাঁর বক্তব্য ছিল হিন্দুস্থান সমাচারের নিজস্ব পরিচালক সমিতি থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিকে প্রধান ব্যবস্থাপক করার অধিকার নেই। মামলা চলে দীর্ঘ ১৮ বছর। হাইকোর্টে মামলায় হেরে সরকার সুপ্রিম কোর্টে আপিলে যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সরকার বাধ্য হয় হিন্দুস্থান সমাচারকে সঙ্ঘ পরিবারের হাতে তুলে দিতে। সময়টা ছিল ২০০০ সাল। বিংশ শতাব্দীর শেষ বছর। মামলায় জিতে চন্দ্রমোহন ভরদ্বাজজী যোগাযোগ করেন শ্রীকান্তজীর সঙ্গে। তিনি তখন সর্বভারতীয় প্রচার প্রমুখ। শ্রীকান্তজীর মনে হয় হিন্দুস্থান সমাচারের মাধ্যমে 'সত্য সংবাদ' মানুষের কাছে তুলে ধরাটাই একবিংশ শতকে আমাদের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। বিশেষত, ক্যাথলিক ধর্মপ্রধান পোপ ভারতে এসে ঘোষণা করেছেন, বিংশ শতকে ভ্যাটিকান সিটির লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র এশিয়াকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করা। অনেকেই হয়তো জানেন না যে ভারতের প্রায় সমস্ত ইংরাজি সংবাদপত্র ও ইংরাজি সংবাদসংস্থাগুলি চার্চের অনুদানেই চলে। এতকাল অর্থ আসতো বকলমে। এখন মনমোহন সিংয়ের সংস্কার নীতির ফলে আর লুকোচুরির প্রয়োজন নেই। সংবাদমাধ্যমে সরাসরিভাবে বিদেশি অর্থ বিনিয়োগ করা যাবে। দেশে সংবাদমাধ্যমের প্রভাব যথেষ্ট বেশি। বিশেষত বিদেশি অর্থে চলা সর্বভারতীয় ইংরাজি ও কিছু হিন্দু টিভি চ্যানেল। এদের প্রভাবেই ভারতে এখন পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং মিশনারি স্কুল কলেজের এমন রমরমা চলছে। শ্রীকান্তজী অনুভব করেছিলেন এমন একটি আদ্যন্ত ভারতীয় সংবাদসংস্থার প্রয়োজন যে সংস্থা ইংরাজির পরিবর্তে কেবলমাত্র আঞ্চলিক ভারতীয় ভাষায় সত্য সংবাদ সেবা দেবে। স্বদেশের স্বচ্ছ সুন্দর ভাবমূর্তি গড়তে সাহায্য করবে। দীর্ঘ বিতর্কের পর সঙ্ঘের কার্যকরী মণ্ডল শ্রীকান্ত জোশীকে হিন্দুস্থান সমাচারের পুনরুত্থানের দায়িত্ব দেয়। তিনিও সাগ্রহে এই দায়িত্ব মাথা পেতে নেন।

এরপরেই শ্রীকান্তজীর ভারত পরিক্রমা শুরু হয়। তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রথম পর্যায়ে দেশের প্রতিটি রাজ্যের রাজধানী শহরে হিন্দুস্থান সমাচারের শাখা অফিস খোলা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, দেশের প্রতিটি জেলা শহরে সাংবাদিক প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মৃত্যুর আগেই শ্রীকান্তজীর সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচারের শাখা নেই এমন একটি রাজ্যও দেশে নেই। দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে বিশাল বিস্তৃত এক সত্য সংবাদ প্রচারের নেটওয়ার্ক। সংস্কৃত সহ মোট ১৮টি ভারতীয় ভাষায় এখন হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ সরবরাহ করে। এমন কঠিন কাজ কত সহজভাবে করে গেছেন হিন্দুস্থান সমাচারের আচার্য শ্রীকান্ত শঙ্কর জোশী। এটা কথার কথা নয়। নিজের চোখে দেখতে হলে দেখুন পড়ুন সংস্থার ওয়েবসাইট— www.hindusthansamachar.com। এমন কর্মযোগীকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

ভাঙড়-এর কায়দায় কি পঞ্চায়েতও দখল হবে?

নিশাকর সোম

'এবার রাজ্যপালকে হলুদ কার্ড দেখাচ্ছি। প্রয়োজনে ভবিষ্যতে লালকার্ড দেখানো হবে...' বক্তা মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জি— মমতার রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু এবং একদা মমতা অভিহিত 'তরমুজ'। কেন সুব্রতবাবু রাজ্যপালকে এই হুমকি দিলেন? কারণ 'ভাঙড়-এর ঘটনার পর রাজ্যপাল বলেছিলেন— 'রাজ্যে গুণ্ডারাজ চলছে।' এর পূর্বেই রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী— যিনি নতুন শিল্প আনতে ব্যর্থ, তিনি বলেছিলেন— 'প্রশাসনের দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। রাজ্যপাল সংবিধানের সীমা ভেঙে যাবেন না।' রাজ্যপাল এর পর বলেন— 'রাজ্যপাল হিসাবেই কথা বলেছি। নিজের বক্তব্য থেকে সরছি না।' এরই প্রত্যুত্তরে সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালকে ধমক দিচ্ছেন--- শাসিয়ে রাখছেন। কি আশ্চর্য, ঠিক এই সময়েই রাজ্যের ডি এম এবং এসপি-দের দলতন্ত্রের জন্য কাজ করার ব্যবস্থা পাকা করা হলো। ডিএম এবং এসপি-দের মূল্যায়নের যে বিভিন্ন স্তরের ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল করে এখন এসপিদের মূল্যায়নে ডিজি এবং ডিএম ও এসপি-দের মূল্যায়ন করবেন স্বরাষ্ট্রসচিব। আর চূড়ান্ত মূল্যায়ন করবেন মুখ্যমন্ত্রী অর্থাৎ মমতা নিজে।

এই ব্যবস্থার ফলে ডিএম এবং এসপি-দের চাকরির ভোমরাটি মমতার হাতের মুঠোয় থাকবে। ফলে ডিএম এবং এসপি-দের কি 'জো হুজুর' করার ব্যবস্থা হলো না? এর কারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে তৃণমূল, সে সম্বন্ধে এই দলের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করতে পারবেন না, ডিএম-দের এমন ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করা হবে যে যাতে তাঁরা তৃণমূলের পঞ্চায়েত দখলের পথ পরিস্কার হয়। এটাকে যদি বিরোধীদল 'ফ্যাসিবাদের পদক্ষেপ' বলে সমালোচনা করে সেটা কি ভুল? ভাঙড়ে বিরোধী দলের বিধায়ক ৭০ বছরের বৃদ্ধ সিপিএমের নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লাকে আক্রমণ। পরবর্তীকালে ভাঙড় এবং বামনঘাটাতে ব্যাপক হাঙ্গামা, গুলি চালানা, গাড়িতে এবং বাড়িতে অগ্নিসংযোগ চলে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যপাল বলেছিলেন 'গুণ্ডারাজ চলছে।'

হাজি রেজ্জাক মোল্লাকে আক্রমণ সম্পর্কে রেজ্জাক বলেছেন, 'মুসলমানদের মধ্যে তাঁর প্রভাব বেড়ে যাওয়াতে আরাবুলের এই আক্রমণ।' ঠিকই। এই কারণে তো 'খাঁটি মুসলমান' প্রমাণ করার জন্য রেজ্জাক মোল্লা— শুধু মোল্লাতন্ত্রে থেমে থাকেননি, হজ করে হাজি হলেন। যা-হোক, আক্রান্ত রেজ্জাক নার্সিং হোমে ভর্তি হলেন। তাঁর কিছু হয়নি বলে তাঁকে 'জোচ্চর' বলা হলো। পরে দেখা যাচ্ছে রেজ্জাকের হাড়ে চিড় দেখা গেছে এবং দাঁত ভেঙেছে। এই অপমানের কারণ হলো পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য এবং তৃণমূলের পঞ্চায়েত দখল করার জন্য আরাবুলের সাহায্য অপরিহার্য। আবার আরাবুলের বিরোধী-গোষ্ঠী মীর তাহের আলি যিনি নগ্ন নৃত্যের সংগঠক, তাঁকেও তৃণমূলের দরকার। একেই বলে 'ইউনিটি অব অপজিটস।' আরাবুল সম্পর্কে পার্থ চ্যাটার্জি বলেন--- 'আরাবুল উদ্যোগী ছেলে। রেজ্জাকের সঙ্গে লড়তে যুধিষ্ঠির হতে হবে নাকি?' পার্থবাবুর এহেন বক্তব্যে তৃণমূলের এবং সিপিএম-এর পেশিশক্তি প্রস্তুতি বাড়াতে সাহায্য করবে। পার্থবাবু সুব্রতকে সরিয়ে ২নং হওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছেন। আরাবুল সম্বন্ধে জনসভায় পরিবহণমন্ত্রী মদন মিত্র, যিনি মমতার 'ইনার কোর'-এর সদস্য এবং মমতার একান্ত অনুগত, তিনি বলেন, 'চাইলে পাঁচ মিনিটে শেষ করতে পারতাম সিপিএম-কে।' তিনি আরও বলেন--- 'আরাবুল দলের 'যুবমশাল', প্রয়োজনে পুরোদল আরাবুলের পাশে থাকবে।'

'আরাবুল কোনও গুণ্ডা-মস্তান নন। তাঁর মতো তাজা নেতাকে মারার চেষ্টা হলে ভাঙড়ের মানুষ কি রসগোল্লা খাবে? মানুষ লাঠি নিয়ে বেরোলে সিপিএম শেষ হয়ে যাবে। শেষের সেদিন হবে ভয়ঙ্কর।' এটা তো সংঘর্ষ সংগঠিত করার নির্দেশ নয় কি? তিনি রেজ্জাক-কে 'পাগল' বলেন। রেজ্জাক অবশ্য মদন মিত্র-কে 'ছাগল' বলেছেন। এতো পেশিশক্তি অর্থাৎ উভয় দলের মাসলমানদের তালঠোকার আহ্বান।

আর একজন রাজ্যমন্ত্রী ববি হাকিম যিনি মমতার 'ইনার কোর'- এর সদস্য তিনি বলেছেন— আরাবুল সংযত ছিলেন।' যখন কথা উঠেছে আরাবুল নিজে ঘুষি মেরেছে। তখন ববি বলছেন— 'সকলে মিলে মারলে আর বাড়ি ফিরতে হোত না।' এরই সঙ্গে পার্থ চট্টোপাধ্যায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সুব্রতবাবু আগে বলেছিলেন— 'রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করব। সংবিধান যে গণ্ডি ওঁর বেঁধে দিয়েছে তাতে ওঁর প্রশাসন চালানোর কথা নয়। প্রশাসন চালায় মন্ত্রিসভা।' এ তো গোপালকৃষ্ণ গান্ধী সম্বন্ধে প্রয়াতমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর।

ভাঙড় পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে দেখা যাচ্ছে মমতার নেতৃত্বে পার্থ-সুব্রত-ফিরহাদ (ববি), মদন মিত্রের অগ্নিস্রাবী বক্তব্য। স্মরণ করা দরকার— মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-মদন মিত্ররা 'সিপিএম-কে নিষিদ্ধ' করার কথা বলেছিলেন। মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় বলেছিলেন 'সিপিএম বিষধর সাপ। সিপিএম-কে ঘৃণা করতে হবে। সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে।' উল্লেখ্য, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভ্রাতা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য। তৃণমূলের এসব কথাবার্তা এবং কাণ্ডের ফলে বিরোধী রাজনৈতিক দল-গোষ্ঠীগুলির ঐক্য করে দেবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

নেতাজী ও রাশিয়া

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

একটা বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকের মাধ্যমে জনৈক শ্রদ্ধেয় পত্রলেখক জানিয়েছেন— ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর নেতাজী যখন সিঙ্গাপুরে প্রবাসী সরকার গড়ে তুলেছিলেন, তখন নাকি সোভিয়েত রাশিয়াও তাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানিয়েছিল। আর জাপানস্থ রুশ-রাষ্ট্রদূত জ্যাকভ মালিক ছিলেন নেতাজীর খুব ঘনিষ্ঠ— ফলে রাশিয়াও নেতাজীর প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। এই দুটো বিষয়ে আমাদের কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এই ব্যাপারে তাই একটু আলোচনা করা একান্তই দরকার। কারণ রাশিয়াকে উদার দেখানোর চেষ্টা চলছে।

প্রথমত, তাঁর সরকারের মন্ত্রী এস এ আয়ার লিখেছেন— উক্ত সরকারকে নয়টি রাষ্ট্র কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল। তারা হলো— জাপান, জার্মানী, ইটালী, ক্রোয়েশিয়া, বার্মা, থাইল্যান্ড, জাতীয় চীন, ফিলিপিন এবং মাঞ্চুরিয়া (ভূমিকা, সিলেক্টেড স্পীচেস অফ সুভাষচন্দ্র বোস, প্রকাশনা বিভাগ, কেন্দ্রীয় সরকার, পৃঃ ২১)। তাঁর দেওয়া এই তালিকায় কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার নামই নেই। সেই দেশ যদি এই ধরনের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তাহলে আজাদ হিন্দ্ সরকারের মন্ত্রী তা জানতেন না? উক্ত গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে, ১৯৭৪ সালের সংস্করণেও রাশিয়ার নাম সংযোজিত হোত না পরবর্তী তথ্যের ভিত্তিতে?

আজাদ হিন্দের সেনাপতি এন এস গিল্ জানিয়েছেন, স্বীকৃতি দিয়েছিল অক্ষশক্তির শরিকরা অর্থাৎ জাপান, জার্মানী ও ইটালী এবং 'the countries under their influence'— তাদের প্রভাবাধীন রাষ্ট্ররা (স্টোরী অফ দ্য আই এন এ, পৃ. ৩৯)। তাদের প্রভাবাধীন রাষ্ট্র বলতে এক্ষেত্রে ক্রোয়েশিয়া, বর্মা থাইল্যান্ড, জাতীয় চীন, ফিলিপিন ও মাঞ্চুরিয়াকেই বোঝানো হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া অবশ্যই অক্ষশক্তির প্রভাবাধীন ছিল না। বরং ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানী হঠাৎ সোভিয়েত রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষেই ঝুঁকে পড়েছিল— অর্থাৎ তার অবস্থান ছিল নেতাজীর বিরুদ্ধ শিবিরে। তার পক্ষে আজাদ হিন্দ্ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়াটা কি বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার?

হিউ টয়ও পূর্বোক্ত নয়টা রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, অক্ষশক্তি ও তার প্রভাবিত ছয়টা দেশ উক্ত সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিলেও ব্যতিক্রম ছিল জার্মানীর অধীন 'ভিকি-ফ্রান্স' —(দ্য স্প্রিংপিং টাইগার, পৃ. ১০০)। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, তিনিও এক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়ার নাম উল্লেখ করেনি। শিশিরকুমার বসু তাঁর 'সুভাষচন্দ্র বোস' গ্রন্থেও (পৃ. ১২৮) পূর্বোক্ত নয়টি দেশের নাম উল্লেখ করেছেন--- বলা বাহুল্য সোভিয়েত রাশিয়ার নাম সেই তালিকায় নেই। কেন এমনটা হলো?

ডঃ সতীশচন্দ্র মাইকাপ মন্তব্য করেছেন— নেতাজীর সরকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল পূর্বোক্ত নয়টা দেশ। তবে আইরিশ ফ্রি স্টেটের প্রখ্যাত ডি-ভ্যালেরা নেতাজীর প্রতি ব্যক্তিগত অভিনন্দন ('personal felicitation') জানিয়েছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া বা স্ট্যালিনের নাম তাঁর গ্রন্থেও দেখছি না (চ্যালেঞ্জ টু দ্য এম্পায়ার, পৃ. ৭৮)। ব্যক্তিগত অভিনন্দনও আসেনি তখন?

নেতাজীর ঘনিষ্ঠ অনুগামী জে এ থিবি বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দানের তারিখও উল্লেখ করেছেন। তাতে দেখছি--- জাপান ১৯৪৩ সালের অক্টোবরের ২৩ তারিখে, বার্মা ২৪ তারিখে, ক্রোয়েশিয়া ২৭ তারিখে, জার্মানী ২৯ তারিখে, জাতীয় চীন ও মাঞ্চুরিয়া ১ নভেম্বরে, ইটালী ৯ নভেম্বরে এবং থাইল্যান্ড ১৯ নভেম্বর কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়েছিল (দ্য স্ট্রাগল্ ইন ইস্ট এশিয়া, পৃ. ৬৮)। এটা লক্ষণীয় যে, তাঁর তালিকাতেও রাশিয়ার নাম নেই। রাশিয়ার স্বীকৃতি-দানটা তাঁরও অজ্ঞাতে ঘটেছে?

এর পরেও কেমন করে বলা যায় যে, সোভিয়েত রাশিয়া সেই প্রবাসী

সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল?

দ্বিতীয়ত, রাশিয়া কখনও নেতাজীকে মিত্র বলে মেনে নেয়নি। ডঃ লিওনার্ড গর্ডনের বিখ্যাত প্রবন্ধ (ব্রাদার্স অ্যাগেনস্ট দ্য রাজ') থেকে জানা যায়— নেতাজী ১৯৪১ সালে রাশিয়ার উদ্দেশেই গোপনে দেশত্যাগ করেছিলেন। স্ট্যালিন তাঁকে কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে কিন্তু জার্মানীর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য— শিশির কুমার বসুর 'দ্য গ্রেট এস্‌কেপ')। এই ব্যাপারে প্রামাণ্য নথিও এতে রয়েছে।

অবশ্য তার কয়েক মাস পরেই জার্মানী হঠাৎ রাশিয়াকে আক্রমণ করেছে। নেতাজীর এটা ভাল লাগেনি। তাছাড়া তিনি বুঝেছিলেন যে, এরপর জার্মানীতে থাকা হবে অর্থহীন। তাঁর জার্মানীস্থল সহযোগী ডঃ গিরিজা কুমার মুখার্জী লিখেছেন, 'He realised that Germain Collapse was near'— জার্মানীর পতন এক অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার— (সুভাষচন্দ্র বোস, পৃ. ৭৪)। তিনি তারপর জাপানের সহযোগিতায় সংগ্রাম শুরু করেছেন। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্বে (১৯৪৪) যখন জাপানেরও পতন আসন্ন, তিনি চেয়েছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন। সেই সময় তিনি জাপানস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত জ্যাকভ মালিকের কাছে একটা খাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা না খুলেই ফেরত দেওয়া হয়েছিল— (ডঃ জয়েস লেব্রা— জাঙ্গল অ্যালায়েন্স, পৃ. ৪৪)। মালিক নাকি ছিলেন নেতাজীর বন্ধু? এর পরেও মেনে নিতে হবে যে, রুশ রাষ্ট্রদূত জ্যাকভ মালিক নেতাজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং রাশিয়া ছিল নেতাজীর প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন? অবশ্য রাশিয়ার বন্ধুত্বের একটা নমুনা দিই। তার সঙ্গে অক্ষশক্তির জার্মানীর যুদ্ধ চললেও জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার কোনও বৈরিতা ছিল না। কিন্তু শেষ দিকে— ৬ আগস্ট ও ৯ আগস্ট দুটো অ্যাটম বোমার ঘায়ে জাপান যখন বিধ্বস্ত হয়ে আত্মসমর্পণের কথা ভেবেছে, সেই সময়ই (৮ আগস্ট) রাশিয়া তার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে। জাপান ছিল ১৯৪৩ সাল থেকে নেতাজীর মিত্র। তাঁকে রাশিয়া বন্ধু ভাবতে পারে? কিংবা তাঁর সরকারকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিতে পারে? এই ধরনের নথিপত্রের কথা জানতে পারলে তবেই আমরা পূর্বোক্ত দাবিটা বিশ্বাস করব। কিছু রুশ ভক্তের ছেঁদো কথায় কোনও কাজ হবে না।

আরেকটা কথা মনে রাখতে হবে। নেতাজী কিন্তু কখনও সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি। তাঁর সংগ্রামটা ছিল ইঙ্গ মার্কিন শক্তির বিরুদ্ধেই (এস. এ. আয়ার— আজাদ হিন্দ্ ফৌজ, অনু : জগদ্বন্ধু ভট্টাচার্য, পৃ. ৮৮)। সেই জন্য তিনি সব সময় সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে ঝোঁকটা দেখিয়েছেন। শেষ সময়েও তিনি রাশিয়াতে আশ্রয় নেওয়ার জন্য বিমান যাত্রা করেছিলেন। অবশ্য, তিনি সেখানে পৌঁছতে পেরেছিলেন কিনা কিংবা রাশিয়া তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিল কিনা, জানি না।

তবে শেষদিকেও যে তিনি রুশ-সাহায্য গ্রহণের কথা ভেবেছিলেন, সেটা তাঁর দুটো ভাষণ ('সোভিয়েত সাপোর্ট ফর ইন্ডিয়া' এবং 'দ্য জার্মান ডিফিট', ২১.৫.৪৫ ও ২৫.৫.৪৫) থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আরও লিখেছেন, তখন তাঁর গন্তব্যস্থল ছিল দাইরেন হয়ে মস্কো (ভূমিকা, সিলেক্টেড স্পীচেস)। এই ধারণাটি— সায়তোরও ('টু দিল্লী, টু দিল্লী' (এ বেকন অ্যাক্রশ এশিয়া, পৃ. ২২৩)।

ডঃ পূরবী রায় জানিয়েছেন, নেতাজী যে রাশিয়ায় ছিলেন, এর বহু তথ্য প্রমাণ আছে। তবে সেটা কি বন্দী অবস্থায়? ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ সেটাই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। নেহরু থেকে শুরু করে সব কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে রুশ কর্তৃপক্ষের দোস্তি ছিল কি এই কারণেই?

একটা কথা মনে রাখা দরকার--- সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিতে এসেছেন বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে, সোভিয়েত রাশিয়া তখনই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২২ সালের এই নভেম্বর রাশিয়ার পেট্রোগার্ডে 'কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল'-এর (কমিন্টার্স) যে চতুর্থ কংগ্রেস বসেছিল, তাতে ডাঙ্গের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও কিন্তু আক্রমণ জানানো হয়েছিল (বাণী দেশপান্ডে--- কম্যুনিস্ট আন্দোলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পৃ. ২০)। ডাঙ্গে তখন কম্যুনিস্ট পার্টি করছেন, কিন্তু হঠাৎ সুভাষের ডাক পড়ল কেন?

সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন ব্যাপারটা। তিনি ছিলেন আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী নেতা, তাই তিনি রুশ-প্রভাবের মধ্যে যেতে চাননি। পরবর্তীকালে তিনি জানিয়েছেন, তিনিও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। কিন্তু সেটা ভারতীয় সমাজতন্ত্র— তার উৎস মার্ক্সবাদ নয়— 'This Socialism did not derive its birth from the books of Karl Marx'---(রঙ্‌পুর ভাষণ, ৩০ মার্চ, ২৯২৯)। গ্রেট ইউনিয়ান ভাষণে তিনি বলেছেন, ভারত তার নিজস্ব ধরনের সমাজতন্ত্র তৈরী করবে--- 'But we should not surrender to the dictates of Amstardum or Moscow'— (সিলেক্‌টেড স্পীচেস, পৃ. ৪৭ ও ৬০)।

তবে রাশিয়ার প্রতি তাঁর দুর্বলতাও ছিল। তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, রাশিয়া বিংশ শতাব্দীতে বিপ্লবের এক নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছে (ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন্স অফ ইন্ডিয়ান রেভোলিউশান, পৃ. ২৪)। দ্বিতীয়ত, তার সামরিক শক্তিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল (ঐ)। তৃতীয়ত, জমিদারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ বৃহত শিল্পের মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলো তিনি রাশিয়া থেকে নিতে চেয়েছেন--- (হরিপুর-ভাষণ, নেতাজী স্পীচস্, ১ম খণ্ড)। বিশেষ করে, রুশ ধাঁচের প্ল্যানিং তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল— তিনি হরিপুরা-কংগ্রেসে সভাপতি হতে। প্ল্যানিং কমিটিও গড়েছিলেন। চেয়েছিলেন রাশিয়ার মতো পরিকল্পিত অর্থনীতি (ক্রশরোড্‌স্, পৃ. ৫২)।

বিশেষ করে হিটলারের উত্থানের পর ত্রিশক্তি সেভাবে রাশিয়াকে একঘরে করে দিয়ে পরোক্ষ তার প্রতি হিট্‌লারকে বিদ্বিষ্ট করে তুলছিল, তাতে সুভাষ ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই সময় রাশিয়ার প্রতি যেন তাঁর মমতা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাশিয়া দূরে থেকে গেছে। এক সময় (১৯৩০) রাশিয়া থেকে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে নির্দেশ এসেছিল— সুভাষ সম্বন্ধে সাবধান হওয়ার জন্য। আর যুদ্ধের সময় তিনি অক্ষশক্তির দিকে থাকায় তিনি নিশ্চয় শত্রু হিসেবেই গণ্য হয়েছেন রাশিয়ার কাছে।

সংস্কার : কোন্ পথে

অম্লানকুসুম ঘোষ

‘সংস্কার’ কথাটি এখন ভারতবর্ষের নাগরিক সমাজে সর্বাধিক ব্যবহৃত। কেন্দ্রীয় সরকার-কৃত অর্থনৈতিক সংস্কার ও তার পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা এখন প্রায় সর্বত্র। এই ‘সংস্কার’ বিষয়টি একটু পর্যালোচনা করে দেখা যাক। সংস্কার কথাটির অর্থ কোনও অপরিস্কৃত জিনিসকে বা ভুল পদ্ধতিকে বা অন্যায় প্রথাকে সংশোধন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে তাকে নতুন রূপে আনা যাতে সেই পদ্ধতি বা প্রথা থেকে জনসাধারণের উপকার হতে পারে। সেই হিসেবে পঙ্গু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তার সংস্কার একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু সংস্কার সঠিক পথে এবং সঠিক পদ্ধতিতে হয়ে অর্থনীতিকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাচ্ছে, না দিক্‌ভ্রান্ত সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে আরও বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে তা বিচার করা সকলেরই আশু কর্তব্য। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রযুক্ত সংস্কারের প্রতিটি পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক এই সংস্কার কোন্ ধরনের।

বর্তমান ভারতে প্রযুক্ত মনমোহনী সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের সব ধরনের বাজারকে বিদেশী পুঁজির সামনে উন্মুক্ত করা। সেই লক্ষ্যেই এফ ডি আই, ব্যাঙ্ক ও বীমা বিল, পেনশন বিল ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এফ ডি আই এর মাধ্যমে দেশের খুচরো ব্যবসাক্ষেত্রকে বিদেশী পুঁজির অবাধ বিচরণক্ষেত্র করে দেওয়া হচ্ছে। ওয়ালমার্ট ইত্যাদি বহুজাতিক সংস্থাগুলি এরপর দেশীয় উৎপাদক ও দেশীয় ক্রেতা অর্থনীতির এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী সংযোগকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চলেছে। বর্তমানে এই সংযোগকারীর ভূমিকায় যে ক্ষুদ্রব্যবসায়ীরা রয়েছেন, এফ ডি আই-এর আশীর্বাদধন্য বহুজাতিকেরা বৃহৎ পুঁজির জোরে তাদের সহজেই সরিয়ে দেবে। এর ফল হবে ত্রিবিধ, প্রথমত, প্রচুর সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী কর্মচ্যুত হবেন, ফলে দেশে বেকার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে যার ফল দেশের অর্থনীতিতে ঋণাত্মক ভাবে পড়বে। দ্বিতীয়ত, বহুজাতিক সংস্থাগুলি অন্য সব ব্যবসায়ীকে বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়ার ফলে ক্রেতারা বহুজাতিক সংস্থাগুলির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, ক্রেতাদের কাছে কোনও বিকল্প বাজার থাকবে না, এই সুযোগে নিজেদের ইচ্ছেমতো দামে খুচরো পণ্য বিক্রি করবে সংস্থাগুলি। বর্তমানে খুচরো বাজারের মূল্য যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার চাহিদা- জোগান ও পারস্পরিক দরাদরিতে ঠিক হয়; এফ ডি আই পরবর্তীকালে আর তা হবে না। তখন বহুজাতিক সংস্থার বোর্ডরুমে প্রাইসিং থিওরির দ্বারা খুচরো দ্রব্যের সেই মূল্যই একতরফাভাবে নির্ধারিত হবে যা সংস্থাকে সর্বাধিক লাভ এনে দেবে। বিকল্প বাজারের সন্ধানহীন ক্রেতারা বাধ্য হয়ে সেই মূল্যেই জিনিস কিনবে। এতে যেমন ক্রেতা হিসেবে সমগ্র দেশবাসীর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ক্ষতি হবে তেমন ক্রেতাদের আপেক্ষিক ব্যয়-ক্ষমতা অর্থাৎ Relative Purchasing Power কমে যাওয়ায় দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে একটা মন্দার ভাব দেখা যাবে। আবার খুচরো বাজারের মূল্যবৃদ্ধি দেশের সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতিকে ঊর্ধ্বমুখী করে দেবে যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হবে। সমগ্র পর্যায়টাকে ব্যাখ্যা করা যাক। অধিক মূল্যে জিনিস কিনতে বাধ্য হলে উপভোক্তাদের অন্য জিনিস কেনার ক্ষমতা কমে যায় অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে মোট বিক্রির পরিমাণ কমে। বিক্রির পরিমাণ কমলে উৎপাদকেরা উৎপাদন করার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ফলস্বরূপ অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। তৃতীয়ত, বহুজাতিক সংস্থা ছাড়া বাজারে অন্য কোনও ব্যবসায়ী না থাকায় উৎপাদকেরা এবং কৃষকেরা বহুজাতিক সংস্থার স্থির করে দেওয়া কম দামে তাদের কাছে উৎপন্ন বস্তু বিক্রি করতে বাধ্য হবে। যার ফলে দেশের বিরাট কৃষকসমাজ অর্থনৈতিক দুর্দশার মধ্যে পড়বে এবং দেশের সামগ্রিক কৃষি-উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। আরও পরবর্তীকালে কৃষকেরা বহুজাতিক সংস্থার কাছে অগ্রিম নিয়ে চাষ করতে বাধ্য হবে যা নীলকর ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

বিশ্লেষণে দেখা গেল এফ ডি আই নীতি সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা এই তিনেরই ক্ষতি করবে এবং সমৃদ্ধ করবে কিছু মুষ্টিমেয় বহুজাতিককে। তাদের লভ্যাংশ বাড়বে এবং সংস্কারের নীতি মেনে সেই লভ্যাংশ পাড়ি দেবে বিদেশে। অর্থাৎ আমাদের দেশের অর্থনীতির যেটুকু সমৃদ্ধি বর্তমানে আছে সেই সমৃদ্ধিটুকুও ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নেবে বিদেশী কোম্পানীরা। তবে এই সর্বনাশা পদক্ষেপ করে তাদেরকে দেশের বাজারে আমন্ত্রণ

এফ ডি আই নীতি সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদক, ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা এই তিনেরই ক্ষতি করবে এবং সমৃদ্ধ করবে কিছু মুষ্টিমেয় বহুজাতিককে। তাদের লভ্যাংশ বাড়বে এবং সংস্কারের নীতি মেনে সেই লভ্যাংশ পাড়ি দেবে বিদেশে। অর্থাৎ আমাদের দেশের অর্থনীতির যেটুকু সমৃদ্ধি বর্তমানে আছে সেই সমৃদ্ধিটুকুও ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নেবে বিদেশী কোম্পানীরা।

জানানো হচ্ছে কেন? কেন্দ্রীয় সরকারের অসার যুক্তি বহুজাতিক সংস্থারা নাকি উৎপাদন-বিক্রয়ের পরিকাঠামো উন্নত করবে, তারা নাকি দেশজ বস্তুর রপ্তানী বাড়াবে। যুক্তিটি হাস্যকর, যে-কোনও ব্যবসায়ী সংস্থার মূল লক্ষ্য থাকে নিজেদের লাভের পরিমাণ বাড়ানো, তাই তারা পরিকাঠামো খাতে ততটুকুই বিনিয়োগ করবে যতটুকু নিজেদের লাভের জন্য দরকার। তার ফলে দেশের আপামর জনসাধারণের কোনও লাভ হবে না, আর রপ্তানী যদি কিছু বাড়ে এবং সেই বর্ধিত রপ্তানীর সুফল পুরোটাই কুক্ষিগত হয় বহুজাতিকদের তাহলে সেই রপ্তানী-বৃদ্ধিতে দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক-বৃদ্ধি কোথায় হলো? তাই বলা যায় খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই দেশকে অর্থনৈতিক পরাধীনতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কারের আর একটি পদক্ষেপ। একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানো যাক্, আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি দীর্ঘদিন ধরে লাভদায়ক সংস্থা রূপে পরিচিত। প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক স্বাধীনতার পরে থেকে এখন পর্যন্ত প্রতি বছর লাভের মুখ দেখেছে। সেই লাভের অঙ্কে পুষ্ট হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ভারতীয় অর্থনীতি। সাম্প্রতিক অতীতে ২০০৮ সালে যখন আমেরিকা- কেন্দ্রিক মন্দার ঝড় গোটা বিশ্বের অর্থনীতিকে কালো মেঘে ঢেকে দিয়েছিল তখন ভারত একমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে নিজের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বজায় রাখতে পেরেছিল। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের বক্তব্য অনুযায়ী ভারত এই বিপর্যয়কে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির জন্য। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির নিয়মনিষ্ঠ ঋণনীতির ফলে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের মতো সাব-প্রাইম লেন্ডিং-এর ফাঁদে পড়েনি। এ হেন অর্থনীতি-বান্ধব রাষ্ট্রায়ত্ত-ব্যাঙ্কগুলিকে বেসরকারি হাতে তুলে দিতে বদ্ধপরিকর কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফল হবে বিষময়। বেসরকারি হাতে থাকা ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র লাভ আদায়কারী সংস্থা হিসেবে ক্ষুদ্র আমানতকারী বা ঋণগ্রহীতাদের স্বার্থের কথা মাথায় রাখবে না। ঋণ অনুমোদনের ক্ষেত্রে কায়েমী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে যা অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়াবে। অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ বাড়ার ফলে ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীদের সঞ্চয় ফেরৎ দেওয়া নিয়ে সমস্যা দেখা যাবে। ফলে গোটা ব্যাঙ্কিং-সিস্টেমের ভবিষ্যত-ই বিপন্ন হয়ে পড়বে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা গোটা দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত। ব্যাঙ্কিং-ব্যবস্থার বিপর্যয়ে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর মতো জাতীয় অর্থনীতি হয়ে পড়বে দিশাহীন। তা হলে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের বেসরকারিকরণ করতে এত উদ্যমী কেন? সরকারের যুক্তি এক্ষেত্রেও হাস্যকর, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে Bosel-I ও Bosel-II মূলধনের জোগান দিতেই নাকি সিদ্ধান্ত। তথ্য খতিয়ে দেখা যাক। ২০১১-১২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলিকে মোট মূলধন জোগান দিয়েছে ১৫ হাজার কোটি টাকা। আর এই অর্থনৈতিক বছরের প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট লাভের পরিমাণ ৭২ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলির লাভের খুব সামান্য একটা অংশ দিয়েই এই মূলধনের প্রয়োজন মেটানো যায়। এই সহজ পথে না গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণের মতো উল্টো পথে গিয়েছে। এর ফলে Bosel নির্ধারিত খুব সামান্য পরিমাণ মূলধনের জোগান দিয়ে বেসরকারি সংস্থারা ব্যাঙ্কের এই বিপুল লাভের বড় অংশ কুক্ষিগত করতে পারবে। আর তার ফল দিতে হবে দেশের সাধারণ মানুষকে।

কেন্দ্রীয় সংস্কারের আর একটি ক্ষেত্র হলো পেনশন ক্ষেত্রের পরিবর্তন। এতদিন পর্যন্ত পেনশন ক্ষেত্রে কর্মচারীদের সঞ্চিত টাকা সরকারের কাছে গচ্ছিত থাকত। সরকারি নানা প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়ে সেই অর্থ কলেবরে বৃদ্ধি পেত। অবসরের সময়ে কর্মীরা তাদের যথোচিত প্রাপ্যের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতেন। কিন্তু বর্তমান সরকার সংস্কারের নামে এই পেনশন প্রকল্পের গচ্ছিত অর্থ শেয়ার বাজারে খাটানোর কথা ভাবছে। অনিশ্চিত শেয়ার বাজারে এই অর্থ খাটালে সেই অর্থ কর্মীর অবসরের সময় সঠিক অনুপাতে না-ও ফেরত আসতে পারে। সমগ্র দেশবাসীর কাছে যা বিশেষ আতঙ্কের। সরকারি-যুক্তি অবশ্য শেয়ার বাজারে পেনশন-ফান্ডের বৃদ্ধির হিসেবটাই শুধু কষেছে, তৎসংলগ্ন ঝুঁকির কথা ভেবে দেখেনি। কথামালা-কথিত একচক্ষু হরিণের মতো অর্থনীতি-জগতের শুধু একটা দিক দেখা এই তথাকথিত সংস্কার দেশের অর্থনীতিকে করবে বিপন্ন।

তথাকথিত সংস্কারের আরেকটি প্রভাব দেখা যাচ্ছে সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে। রাজস্ব-ঘাটতি কমানোর নামে সরকার সবরকমের ভর্তুকি কমানোর বা বন্ধ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসেবে পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ানো, গৃহস্থের গ্যাসের বরাদ্দ কমানো ইত্যাদি পদক্ষেপ সরকার নিচ্ছে। নিরপেক্ষ অর্থনীতি-বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে কিন্তু এই পদক্ষেপগুলি গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া বলে মনে হয়। পেট্রোপণ্য খাতে ব্যয় সরকারের অন্যতম বড় ব্যয়। কিন্তু পেট্রোপণ্যের বিকল্পের ব্যবস্থা না করে শুধুমাত্র পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করলেই এই ব্যয় হ্রাস পাবে না। ভারতবর্ষে সৌরবিদ্যুৎ এবং জলবিদ্যুৎ ইত্যাদির সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলবর্তী এলাকায় হাওয়াকল- চালিত বিদ্যুৎ বা সমুদ্র-স্রোতজনিত বিদ্যুৎ-এরও সম্ভাবনা রয়েছে। এইসব নানাপ্রকার বিদ্যুৎ-এর সাহায্যে দেশে পেট্রোপণ্যের মোট চাহিদাকে কমিয়ে আনা যেত, ফলে সরকারের খরচ আপনা-আপনি কমিয়ে আনা যেত। সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি। নিখুঁত পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলে দেশের অর্থনীতিকে সংস্কারের পথে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তা না করে সরকার অতি দ্রুত কিছু অপ্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, দেশও সংস্কারের সঠিক পথে না গিয়ে বহুদূরে পেছিয়ে যাচ্ছে। আবার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতিকে ঊর্ধ্বমুখী করছে, ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রেপো রেট্ ও রিভার্স রেপো রেট কমাতে পারছে না। এ কারণে ঋণের ওপর সুদের হার অত্যন্ত চড়া থাকছে। ফলে বিনিয়োগ আশানুরূপ হচ্ছে না যা জি ডি পি গ্রোথ রেটকে হ্রাসপ্রাপ্ত করছে।

সংস্কারের আরেকটি অঙ্গ হিসেবে বড়

কোম্পানিগুলির সামনে ফাটকাবাজির সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, অর্থাৎ অগ্রিম লেনদেনের বাজারকে আইনসিদ্ধ করা হচ্ছে। এর ফলে মজুতদারি ও কালোবাজারি আরও বাড়বে। বিশেষ করে খাদ্যবস্তুতে অগ্রিম লেনদেনের ফলে দেশে পুনর্বার মনুষ্যসৃষ্ট দুর্ভিক্ষ সৃষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। সবচেয়ে অদ্ভুত এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনও যুক্তি দেখানো বা কারণ নির্দেশ করাই হয়নি। কোনও কারণ ছাড়াই এত বড় একটি আত্মঘাতী পদক্ষেপ সরকার নিতে চলেছে।

সরকারের এই অত্যদ্ভুত সংস্কারের অবশ্যম্ভাবী ফল হলো দুর্নীতি। সংস্কাররূপী পদক্ষেপগুলি সবই করা হয়েছে বড় কর্পোরেট সংস্থাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে আর তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য সরকারি নীতি নির্ধারকদের খুশি করতে কার্পণ্য করেনি। তাই তো দেখা যাচ্ছে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিনা পয়সায় চলে যাচ্ছে বেসরকারি এমনকী বিদেশী মালিকানায়। তাই তো দেখা যাচ্ছে ভারতের রাজনীতিবিদরা কালো টাকার প্রশ্নে বিশ্বে এক নম্বর। ওয়ালমার্টের মতো সংস্থা নিজেদের বার্ষিক হিসেবে প্রকাশ্যে জানিয়েছে ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার পাবার জন্য তারা খরচ করেছে কয়েকশো কোটি টাকা। অর্থাৎ ভারতে বাণিজ্য করার জন্য সরকারি কর্তাদের ঘুষ দিয়েছে ওই কয়েকশো কোটি টাকা। প্রশ্ন ওঠে প্রকাশ্যে যারা কয়েকশো কোটি টাকা ঘুষ দেবার কথা স্বীকার করে তারা গোপনে আরও কত টাকা ঘুষ হিসেবে দেয় রাজনীতির কারবারিদের। হিমশৈলের চূড়াটিই যেখানে আয়তনে এত বিশাল সেখানে সম্পূর্ণ হিমশৈলটি তো গোটা দেশকে গ্রাস করে ফেলতে পারে আন্ডার গ্রাউন্ড ইকনমিক্সের কৃষ্ণগহ্বরে। ভারতের বাজার গোটা বিশ্বের কাছে ঈর্ষণীয়, আর সেই বাজার আজ বহুজাতিকদের কাছে খুলে গেল বেশ কিছু কাঞ্চন মুদ্রার বিনিময়ে।

দেশ যখন পরাধীন ছিল তখন দেশের উৎপাদন-ক্ষেত্র, দেশের বাজার এবং দেশের পুঁজি ও সঞ্চয় সবই ছিল বিদেশীর কুক্ষিগত, তাই স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিত মহান দেশপ্রেমিকরা বিদেশীর হাত থেকে দেশের হাতে ফিরিয়ে এনেছিলেন সে-সবের অধিকার অসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে। আর আজ স্বাধীনতার চৌষট্টি বছর পর যখন ভারতের উচিত গোটা বিশ্বকে পথ দেখানো তখন ভারতবর্ষ কিছু অসাধু ব্যক্তির হঠকারী পদক্ষেপে নিজেকে বিলিয়ে দিচ্ছে বিদেশীর কাছে। দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা অটুট আছে কিন্তু এই বিচিত্র সংস্কারের ধাক্কায় দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আজ বিপন্ন। দেশের উৎপাদনক্ষেত্র, বাজার, পুঁজি ও সঞ্চয়কে একচেটিয়াভাবে বিদেশীর হাতে তুলে দেওয়ার এই যে পদ্ধতি একে কি সংস্কার বলা যায়? বিদেশী বণিককে মানদণ্ড হাতে ঘুরপথে যারা এদেশের রাজদণ্ড ধরার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে তাদেরকে কি অর্থনীতিবিদ্ বলা যায়? ইতিহাস যেন ফিরে ফিরে আসে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদধ্বনি যেন অধুনা বহুজাতিকদের থেকে শোনা যাচ্ছে।

এক কথায় বলা যায়, যে সংস্কার দেশকে উন্নতির বদলে এইরকম পতনের চোরাগলিতে ঠেলে দেয় তাকে অর্থনৈতিক সংস্কার না বলে অর্থনৈতিক কু-সংস্কার বলা উচিত।

Ori Plast

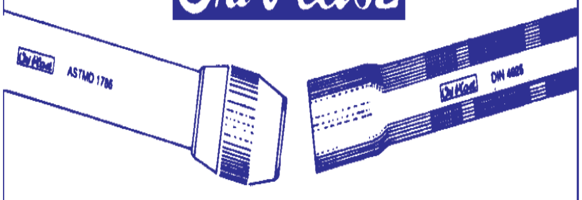

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না — সঃ স্বঃ

কোম্পানী বিল, ফেমা সংশোধনী বিল, ব্যাঙ্ক সংশোধনী বিল পাশ ও সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা

এন. সি. দে

বিদেশী পত্র-পত্রিকা, বিশেষ করে মার্কিন পত্র-পত্রিকাগুলিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে নিষ্কর্মা, অপদার্থ, অযোগ্য ইত্যাদি ভাষায় গালিগালাজ করার পর, হঠাৎ তিনি তাঁর বিদেশি প্রভুদের কাছে যোগ্যতা প্রমাণের প্রতিযোগিতায় তেড়ে-ফুঁড়ে নেমে পড়েছেন, যা দেশকে এক চরম ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে চলেছে। ক্ষমতাবান নিষ্কর্মার অভিমান যে কী ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তার উদাহরণ আমরা দেখেছি কবিগুরুর নাটক 'রাজা-রাণী'-তে। রাজা বিক্রম একজন ক্ষমতাবান শাসক, কিন্তু তিনি অলস, স্ত্রৈন্য ও রাণী মহলে সর্বসময় আবদ্ধ রাণীর রূপ বিলাসী এক নিষ্কর্মা পুরুষ। রাজ্যের প্রজাদের দারিদ্র্য ও হাহাকার তাঁর কানে পৌঁছায় না। প্রজা-বিদ্রোহ যখন সমাসন্ন, তখন রাণীর ধিক্কারে অভিমানাহত হয়ে রণক্ষেত্রে যে নৃশংসতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, তা প্রতিটি নিষ্কর্মা ক্ষমতাবানের নৃশংসতার এক নাট্য-দলিল হয়ে আছে বাংলা তথা বিশ্ব সাহিত্যে।

আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-ও এই নাট্য-দলিলের একজন কুশীলব। বাইরের মানুষের হাহাকার তাঁর কানে পৌঁছায়নি, কিন্তু অন্দরমহলে যাদের তিনি সেবাদাস ছিলেন, তাদের ধিক্কারে তিনি ক্ষমতা দেখাতে নেমে পড়েছেন সদলবলে। গত সংসদ অধিবেশনে তিনি নজিরবিহীন তাড়াহুড়ো করে একের পর এক সংস্কারাচ্ছন্ন বিল পেশ ও পাশ করিয়েছেন ছলে-বলে ও কৌশলে। কীরকম সেই সব বিল অর্থাৎ আইন, দেশের পক্ষে কতটা লাভজনক বা ক্ষতিকারক সেই সমস্ত আইন, তা নিয়েই একটু আলোচনা করা যাক।

প্রথমেই উত্তাল হলো সংসদ, খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের দরজা খুলে দেওয়ার বিতর্ক ও ভোটাভুটি নিয়ে। বিদেশিরা আমাদের বিশাল খুচরো বাজার দখল করতে মার্কিন পুঁজিবাদী সরকারের কাছে লবি করতে ১২৫ কোটি খরচ করেছে। আমাদের দৃষ্টিতে যা ঘুষ বলেই পরিচিত। তাই এই এফ ডি আই এবং এফ ই এম এ (Foreign Exchange Management Act) পাশ করানোর তাগিদ মার্কিন রিটেল জায়েন্ট ওয়ালমার্টের বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই তাগিদটা যখন আমাদেরই দেশের কোনও কোনও দলের এবং সরকারের হয় তখন তা অস্বাভাবিক লাগাটাই স্বাভাবিক। এফ ডি আই নিয়ে ভোটাভুটি করতে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। এ নিয়ে সংসদের অনেকগুলো মূল্যবান দিন নষ্ট হয়েছিল। অবশেষে ভোটাভুটিতে রাজি হলেও তা স্বাভাবিকভাবে চলতে দেয়নি। সংসদের বেশির ভাগ সদস্য এবং বেশির ভাগ দল তাদের বক্তব্যে বিদেশী লগ্নির বিরোধিতা করলেও, ভোটাভুটির সময় এস পি এবং বিএসপি-র দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের সিবিআই অস্ত্র দেখিয়ে তাদের ভোটাভুটিতে বিরত করেছিল কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এবং তারা ভোট না দেওয়ায় বিরোধীরা এফ ডি আই আটকাতে পারল না। এই সুযোগে বিদেশি মুদ্রা ব্যবস্থা আইন FEMA (Foreign Exchange Management Act)-এর সংশোধন করে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী অর্থ লগ্নির ব্যবস্থা করে দেয়।

কী এই FEMA Rules?

FEMA Rules হলো সেই আইনি বিধান যার দ্বারা বিদেশী মুদ্রা এদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যে লগ্নিতে ব্যবস্থাপনা করা হয়। আগে এই আইনটির নাম ছিল FEMA (Foreign Exchange Management Act) অর্থাৎ Regulation (নিয়ন্ত্রণ)-এর জায়গায় এখন করা হলো Management অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা। অতএব বোঝাই যাচ্ছে এই আইনটি আগেই শিথিল করা হয়েছিল। কিন্তু দেশীয় খুচরো ব্যবসা-বাণিজ্যে অবাধ বিদেশি মুদ্রার লেনদেনের উপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিলই। তাই খুচরো ব্যবসায় বিদেশি মুদ্রার প্রত্যক্ষ লগ্নির দরজা খুলে দিতে এফ ই এম এ রুলস্ সংশোধনী ছিল জরুরি। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে এই নির্দেশেই দিয়েছিল। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যে কোনও সংশোধনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে সংসদে পেশ করতে হবে। বিজেপি ও বামপন্থীরা এই সংশোধনীর বিরোধিতা করার হুঙ্কার দিয়েছিল, কিন্তু এই আইনটিরও সংশোধনী সংসদে পাশ হয়ে গেল নীরবে, নির্বিঘ্নে এবং নিশ্চিন্তে।

খুচরো ব্যবসায় এফ ডি আই প্রবেশের কি কি বিপদ?

এফ ডি আই প্রবেশ মানে বিদেশি পুঁজি বা মুদ্রার সরাসরি এদেশের খুচরো ব্যবসায় প্রবেশ। এই খুচরো ব্যবসাই হলো দেশের বুনিয়াদি শিল্পের অঙ্গ। লক্ষ কোটি টাকা যুক্ত এই ব্যবসায়। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ নিযুক্ত আছে এই অল্প-পুঁজি নিয়োজিত মুদির দোকান, পান-বিড়ির দোকান, মণিহারির দোকান, স্টেশনারি, ভ্যারাইটি স্টোর্স, কামার-কুমোরের দোকান, তরিতরকারির

দোকান, হকারি, শাঁখারি, মেলায় বসা রকমারি দোকান ইত্যাদি ইত্যাদি। কংগ্রেস-সরকার স্বাধীনতার পর থেকেই এই ব্যবসাকে সংগঠিত করেনি। আর আজ এই অসংগঠিত ব্যবসাকে তারা নিক্ষেপ করেছে দেশি-বিদেশি অত্যন্ত সংগঠিত খুচরো ব্যবসায়ী দৈত্যদের সম্মুখে। এগুলি হচ্ছে প্যান্টালুন, শপার্স স্টপ, মার্কস এন্ড স্পেনসার, হাইপার সিটি, ট্রেন্ট, রিলায়েন্স রিটেল, সুভিক্ষা, ওয়ালমার্ট ব্যবসা করছে ভারতীয় ওয়ালমার্ট নাম দিয়ে ১৭টি ক্যাম্প অ্যান্ড ক্যারি স্টোর্সের মাধ্যমে আর ভারতী এন্টার প্রাইজ রিটেল ভেনচার নাম দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে ১৮০টি Easy Day Super Market। দিল্লী হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলাও হয়েছে। আর এখন তো খুচরো ব্যবসায় ৫১ শতাংশ বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের বিলই পাশ হয়ে গেল। বেকার হয়ে যাবে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ স্ব-রোজগেরে মানুষ। দেখা দেবে সেই ইংরেজ অনুপ্রবেশের অচিরেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। কংগ্রেস-জোট সরকার ও তার চাটুকার পত্র-পত্রিকার ও টিভি চ্যানেলের পছন্দের কেনা গোলামরা খুচরো ব্যবসায় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের নানান সুফলের কথা বলে যাচ্ছেন। বিদেশি ওয়ালমার্ট গোষ্ঠীর মতো বিদেশি সংস্থা এদেশে আসছে আমাদের কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য, আমাদের কৃষির উন্নতির জন্য। একথা কি বিশ্বাসযোগ্য? মার্কিন সরকারকে ১২৫ কোটি অর্থ ঘুষ দিয়ে ওরা আমাদের কৃষি ও কৃষকদের সেবা করতে আসছে— একথা আমাদের দেশী বুদ্ধিজীবীদের মুখে শুনে বিদেশিরাও হয়তো আড়ালে হাসছে, বলছে— কি নির্বোধ এদেশের লোকেরা! ওরা যুক্তি দিচ্ছে বহু পণ্যের খুচরো ব্যবসায় মাত্র ৫১ শতাংশ ক্ষেত্রেই তো বিদেশি পুঁজি খাটতে পারবে, তার উপরে আবার ৩০ শতাংশ উৎপাদিত দ্রব্য কিনতে হবে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র শিল্পসংস্থা থেকে যাদের মূলধন ১০ লক্ষ ডলারের কম। কিন্তু এইসব জটিল শতাংশের হিসাব কে রাখবে? কেউ না! শুধু নিজের সার্টিফিকেট নিজে দিলেই চলবে? অডিটর তা কেবল চেক করবে। ক্যাগ তো এদেশের সরকারি সংস্থার অডিট করতে পারে। বেসরকারি দেশি-বিদেশী সংস্থাগুলোর অডিট করার এক্তিয়ার তাদের নেই। তাহলে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকারের পক্ষে ওই সার্টিফিকেট ঘুষ দিয়ে যোগাড় করা বন্ধ করা কি সম্ভব হবে? মোটেই নয়। এখনই অনেক মামলা এই বিদেশি কোম্পানীগুলোর বিরুদ্ধে আদালতে ঝুলছে। কর্পোরেট কারচুপির নানান নিদর্শন আমরা জানি। আদিদাস গ্রুপ তাদের ভারতীয় কোম্পানী Reebok India'-র দুই প্রধানকে দিয়ে ৮৭০ কোটি টাকা কোম্পানীর বাজার মূল্য কম করে দেখাতে বাধ্য করেছে; অথচ ধরা পড়ে তাদেরই দুজনকে হিসাব কারচুপির দায়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে এক-পণ্যের খুচরো ব্যবসা (Single branded Retail Business) যখন বিদেশিদের জন্য অবাধ করে দেওয়া হয়েছিল তখনই সরকার শর্ত দিয়েছিল বিদেশি কোম্পানীগুলো কোনও দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারবে না, শুধু রপ্তানি করতে হবে; আর কোনও শোরুম খুলে পণ্য বিক্রি করতে পারবে না, কেবল পাইকারি (Whole Sale) ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন তদন্তকারী (এফ ডি, এস এফ আই ও) সংস্থার তদন্তে ধরা পড়েছে Reebok India বিদেশি মুদ্রা আইন (এফ ই এস এ) লঙ্ঘন করেছে, আর্থিক কারচুপি (Money loundering) করেছে ও রপ্তানীর শর্ত অমান্য করেছে। গত ১০ বছরে ৮,০০০ কোটি টাকা শুধু পণ্যই রপ্তানি করেনি, উল্টে ওদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইউনিটগুলোর সস্তা মাল এদেশে আমদানী করে বিক্রি করেছে বেআইনী ভাবে খুলে বসা শোরুম থেকে। এদেশে উৎপাদন প্রায় কিছুই করেনি। ওয়ালমার্টের বেআইনি ব্যবসার কথা তো আগেই বলেছি। সারা দুনিয়ার জুড়ে এদের মুলুকে ওদের Foreign Corrupt Practiees Act'-র অধীনে বিচার চলছে। আমাদের সরকারও বাধ্য হয়ে ওদের বিরুদ্ধে Enquiry committee বসিয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক Bharti walmart/cadar Support Services Ltd. ও Flipkart online Services Pvt. Ltd.-দের ব্যাপারে Enforcement Directorate-কে তদন্ত করতে বলেছে। বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশের বিপদ অনেক। সে বিষয়ে লিখতে গেলে শুধুই এফ ডি আই নিয়েই অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে এই লেখাটি। শুধু একটি সরকারি বিপদের পরিসংখ্যান দিয়েই এই অধ্যায়টি শেষ করছি। বিদেশি পুঁজি দেশীয় ব্যবসায় ঢুকিয়ে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ঢাক পেটানো হচ্ছে তা কর্মনিযুক্তির (employment বা job) বদলে সৃষ্টি করছে কর্মহীনতা (jobless growth)। সম্প্রতি World Development Report 2013 jobs জানিয়েছে ভারতে পার্টটাইম চাকরী বাড়ছে, মাঝারি শিল্প বাড়ছে না এবং অস্থায়ী নিয়োগ সংগঠিত শিল্পেও বেড়েছে। ২০০৮ সালে ৩২ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে হয়েছে ৬৮ শতাংশ। প্ল্যানিং কমিশনের রিপোর্টেও বলা হয়েছে ২০০৪-০৫ বর্ষ থেকে কোনও কর্ম সৃষ্টি (job creation) হয়নি। শুধুই দিন-মজুরের সংখ্যা ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ ৮০ হাজার, ২০০৯-১০-এ যা দাঁড়ায় ৪০ কোটি ৮০ হাজারে।

নয়া কোম্পানী আইন কেন দরকার হলো?

এফ ডি আই সম্পর্কে যেরকম গালগল্প সরকারি বুদ্ধিজীবী ভাষ্যকাররা শুনিয়েছিলেন, সংশোধিত কোম্পানী আইন, ২০১২ সম্পর্কেও তারা একই বাগাড়ম্বর করছেন। এই বিলটি ২০১১ সালে সংসদে পেশ হয়েছিল এবং বহুবার বাধা-বিপত্তিতে স্ট্যান্ডিং কমিটিতে পাঠাতে হয়েছিল। দু-দুবার অর্থবিষয়ক সংসদীয় কমিটি দ্বারা ভোট পায়। অন্যান্য বিষয় ছেড়ে দিয়ে কর্পোরেট-বিষয়কমন্ত্রী সচিন পাইলট মহাশয় শুধু এই আইনের কর্পোরেট হাউসগুলির সামাজিক দায়িত্ব পালনের ধারাটিই প্রচার করে থাকেন। এই আইনের একটি ধারাতে নাকি বলা হয়েছে লাভজনক কোম্পানীগুলোকে তাদের পরপর তিন বছরের নীট লাভের ২ শতাংশ সামাজিক কাজে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এই দায়িত্ব পালনটিও তাদের সদিচ্ছার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ বিড়ালকে তপস্বী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যারা ঘুষ দিয়ে কাজ বাগায়, ট্যাক্স ফাঁকি দেয়, ব্যাঙ্ক

লোন নিয়ে ফেরত দেয় না ইত্যাদি। এই বিলের সবচেয়ে বিপজ্জনক ধারা এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তার সংখ্যা মূলতঃ দুটি। একটি ধারায় দেশি কোম্পানীর বিদেশি হাতে চলে যাওয়ার পথটি সুগম করা হয়েছে। আগের আইনে বিদেশি কোম্পানীর দেশীয় কোম্পানীতে পরিণত হওয়ার পথটি ছিল সুগম। এবারের আইনটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার, অপর ধারাটিতে কোম্পানীতে লালবাতি জ্বালানোর পদ্ধতি সরল করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনার সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি দুর্নীতিগ্রস্ত শ্রম, শ্রমিক ও শিল্পের বিরোধী কংগ্রেস সরকারের কাছে শ্রম, শ্রমিক ও শিল্পের স্বার্থে কোনও শ্রম ও শিল্প আইন সংস্কার আশা করা অন্যায়।

ব্যাঙ্কিং আইন সংশোধনের দরকার হলো কেন?

শেষ পর্যন্ত Banking Laws (Amendment) Bill, 2011-ও সংসদের রাজ্যসভাতেও পাশ করে দিল বিরোধী দল। যে সমস্ত সাধারণ মানুষ এতদিন বলত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কোনও কাজ হয় না, আগেই ভাল ছিল, এবার তারা আবার দেখতে পাবে ১৯৬৯ সালের ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা। এই প্রজন্মের যুবকরা তো দেখেনি সেদিনের সেইসব বেসরকারি টাটা, বিড়লা চালিত ব্যাঙ্ক যারা দিনে-রাতে গণেশ উল্টে পালাতো জনগণকে ভিখিরি বানিয়ে দিয়ে। এই সংশোধনীর প্রধান উদ্দেশ্যই হলো দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক খোলার অবাধ অধিকার। এদের ভোটদানের অধিকার বেসরকারী ব্যাঙ্কে আপাতত করা হলো ২৬ শতাংশ, আর সরকারি ব্যাঙ্কে করা হলো ১০ শতাংশ; সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে সংযুক্তি ও পরে অধিগ্রহণের সুযোগও (Merger & Acquisition) বাড়ানো হলো, যাতে দেশীয় ব্যাঙ্কগুলো ধীরে ধীরে বিদেশিদের পেটে ঢুকে যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স দেওয়া শুরু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে L & T, Tatas, Aditya Birla Group, Bajaj Finserr, Shriram Transport, Religare, ADAG, LICHF ও SREI। বিপদ আরও আছে। পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে, এখন শুধু এটুকু জেনে রাখুন অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কই প্রথমে মিলে যাবে, পরে উঠে যাবে, বিদেশের লেম্যান ব্রাদার্স, মেরিল লিঞ্চের মতো হাতে গোনা ২-৩টি বৃহৎ ইনভেস্টম্যান ব্যাঙ্ককে যারা টাকা জমা রাখার জন্য কোনও সুদ দেবে না, বা ১-২ শতাংশ সুদ দেবে, কেবল ব্যবসায়িক ঋণ দেবে উচ্চ সুদে। এই হলো দেশের ভবিতব্য।

চাকুরীতে সংরক্ষণ বিল কেন?

এই বিলেও বিরোধীদের সমর্থন আদায় করে নিয়েছে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার। জাত-পাত-ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক তাস খেলতে অভ্যস্ত কংগ্রেস বিগত ৬৫ বছরেও দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়কে যখন জাতীয় ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন-সূত্রে গাঁথতে পারেনি, তখন আগামী ১৬৫ বছরেও তারা এদের অনুন্নত করে রেখে সংরক্ষণের বিভেদমূলক রাজনীতি করেই যাবে। কংগ্রেসের তৈরি এই কালো অধ্যায়ে বিজেপি'র নামও যুক্ত হলো, এটাই একজন একাত্মমানবতাবাদী হিন্দুর কাছে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস জে কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।

ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

চিঠিপত্র

হাজি রেজ্জাক মোল্লার দাওয়াই

কমিউনিজমের উন্নয়নে ইস্‌লামেই এখন ত্রাতা, 'হাজি' রেজ্জাক মোল্লার অভিমত। কলকাতার হাজি মহম্মদ মহসিন স্কোয়ারের আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সংবর্ধনা নিয়ে সদ্য হজ সেরে ফেরত সি পি আই (এম) নেতা ও প্রাক্তন ভূমি ও রাজস্বমন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের কড়া সমালোচনা করেন। সংবর্ধনার আয়োজক সারা বাংলা সংখ্যালঘু কাউন্সিল। সংবর্ধনা পেয়ে হাজি সাহেব নাকি দারুণ উচ্ছ্বসিত এবং গর্বিত। মাথা মুড়িয়ে গলায় হাজি রুমাল বেঁধে সিপিএম-এর এই আলোচিত নেতা কমিউনিস্টদের ইসলামের কাছে প্রকারান্তরে দীক্ষিত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। হাজি রেজ্জাক বলেছেন, "কমিউনিজমের যা অবস্থা তাতে একমাত্র ইসলামকে অবলম্বন করেই তাঁর উন্নয়ন সম্ভব।" খবরে প্রকাশ, হাজি সাহেবের ভাষণের পুরোটাই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। আরবির পাশাপাশি বিভিন্ন ভাষাতে ইসলাম ধর্মের চর্চার উপর জোর দেন হাজি সাহেব।

একসময় পুজোপাঠ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রয়াত সিপিএম নেতা সুভাষ চক্রবর্তী এবং শ্রীহরি ভট্টাচার্যের উপর দল ফরমান জারি করেছিল। তারাপীঠে পুজো দেওয়া নিয়ে বিতর্কের সময় সুভাষবাবু বলেছিলেন, তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ এই পরিচয় অস্বীকার করতে পারবেন না। রেজ্জাক সাহেবেরও সাফ কথা, 'আমার একটা রাজনৈতিক এবং সামাজিক সত্তা আছে। এই সামাজিক সত্তাকে কখনও বিসর্জন দিইনি। আমি তো মুসলমান, নামাজ পড়তে, রোজা রাখতে পারলে হজে যেতে পারব না কেন?' এই কথাই তিনি বলেছেন বিমান বসুকে। কিন্তু তাঁর দলতো নাস্তিক। রেজ্জাক সাহেবের সপাট জবাব, "দল নাস্তিক বা আস্তিক নয়। কেউ কেউ নাস্তিক দাবী করে। কিন্তু তাদের বাড়িতে বৌয়েরা লক্ষ্মীপুজো করে। এরা সব ভেজাল সিপিএম।"

হাজি সাহেবকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে জামায়েতে উলেমায়ে হিন্দের নেতা মোঃ সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী আপ্লুত হয়ে আলিঙ্গন করেছেন। এই দুজন দুজনার। সুভাষ চক্রবর্তীর উপর ফরমান জারি করলেও রেজ্জাক মোল্লার উপর তা যে সম্ভব নয় এবং সঠিক নয়, তা আলিমুদ্দিনের লালবাবুরা বেশ ভালই বোঝেন। ভোট ব্যাঙ্ক তুষ্টির ব্যাপার। তবে কমিউনিজমের উন্নয়নের জন্য হাজি সাহেবের সুপরামর্শ নিয়ে নিশ্চয়ই আলিমুদ্দিনের কমরেডরা সন্তুষ্ট হবেন। সাবাস কমরেড (!), লাল সালাম।

—তুষার সরকার, ছাইগড়িয়া বাইলেন কোচবিহার।

হিন্দুদের বিয়ের বয়স

প্রায় প্রতিদিন আমরা ধর্ষণের ঘটনা পড়ি। এ হলো এক অসুস্থ সমাজের লক্ষণ। ধর্ষণ, জঙ্গি হানা, অকালমৃত্যুর ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে। দিল্লীতে ধর্ষণের মর্মান্তিক ঘটনা ও প্রতিবাদ আন্দোলন সকলকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে। কঠোর আইনের অভাবেই কি এমন পাশবিক ঘটনা ঘটে চলছে? সমাজের সকলে যাতে সুস্থভাবে সুখী জীবনযাপন করতে পারে সেই ভাবনা-চিন্তাই শুরু করা দরকার। সেই আদর্শই বৈদিক সমাজ ভাবনায় আছে। সমস্যাটি যে কেবল কঠোর আইনের দ্বারা দূর করা সম্ভব তা মনে হয় না। যে যে বিষয় এই সমস্যা সৃষ্টির কারণ হতে পারে তার কতগুলি অনুসন্ধানের বিষয় হলো :

(১) স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপনের সুযোগের অভাবে কি পুরুষেরা কি এই ধরনের বর্বর পাশবিক অপরাধ করে তা অনুসন্ধান করা। (২) ধর্ষণ কি এক ধরনের মানসিক রোগের ফলে ঘটে? (৩) কোন বয়সীরা সাধারণত ধর্ষণকারী হয়? (৪) সামাজিক পরিবেশ প্রভাব এজন্য কতটা দায়ী?

প্রথম বিষয় সম্পর্কে বাস্তব ঘটনা হলো বয়ঃসন্ধি হলেই হিন্দু ছেলে ও মেয়েদের বিবাহ করা বে-আইনী, কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে আইনী। বৈদিক নিয়ম ছিল বিবাহ ধর্মীয় বিষয়, চুক্তি নয়। বিবাহ সামাজিক ও ব্যক্তিগত। ১৯৫৫ সালে হিন্দু বিবাহ আইন কংগ্রেস বলবৎ করে। হিন্দুর ক্ষেত্রে এক স্ত্রী, একাধিক স্ত্রী অপরাধ। কিন্তু একজন মুসলমাদের চারজন স্ত্রী থাকলেও সে সুনাগরিক। হিন্দুর ক্ষেত্রে স্ত্রী অসুস্থ, অক্ষম হলেও তাকে ত্যাগ করা হয় না, বাস্তবেও সম্ভব হয় না। এরকম পরিস্থিতিতে অনেক হিন্দু পুরুষকে দাম্পত্য জীবন বঞ্চিত হয়েও থাকতে হয়। হিন্দুদের যৌন ক্ষুধার কষ্ট ভোগ করতে হতে পারে কিন্তু মুসলমানদের সে সম্ভাবনা থাকে না। হিন্দু বিবাহ আইনের জন্য হিন্দু যুবকদের মধ্যে যেমন মুসলমান হবার প্রবণতা সৃষ্টি হয় এবং কিছু হিন্দুর মুসলমান হবার কথাও শোনা যায়। অতৃপ্ত যৌন ক্ষুধা ধর্ষণের কারণ হতেই পারে।

আবার বয়ঃসন্ধি হলেই হিন্দু ছেলেদের বিবাহ করা বে-আইনী, কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে আইনী। বর্তমানে ২১ বছর হলো হিন্দু ছেলেদের বিয়ের বয়স। প্রকৃতির নিয়মে ২১ বছরের বহু পূর্বেই যৌনজীবন যাপনের ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সর্বত্রই ভোগবাদী জীবন-সংস্কৃতি, উত্তেজক খাদ্য ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ। ২১ বছর পর্যন্ত কি হিন্দু ছেলেদের ব্রহ্মচারী থাকা সম্ভব? এই রকম পরিস্থিতিতে আকস্মিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

পোশাক প্রস্তুতকারীরা যৌন আবেদন সৃষ্টি হয় তেমনই ফ্যাসানের পোশাক তৈরি করে। কিছু পত্র-পত্রিকা ভারতের নারীদের ছবি ভোগ্যবস্তুর মতো উপস্থাপন কর। উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে দামে সস্তা, পৃষ্ঠায় বেশি এক ইংরেজী সংবাদপত্রে প্রায়ই নগ্ন নারীদেহের ছবি ছাপায় যার উদ্দেশ্য মোটেই ভাল বলা চলে না। অপরাধ প্রবণতার পরিবেশ তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা আছে ওইসব পত্রিকার।

(১) হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমূলক আইন স্বাধীনতার পরে বলবৎ করা হয়েছে— যেমন হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দুদের বিবাহের বয়সের আইন— তা বাতিল করতে জনমত সৃষ্টি করা, (২) যৌন উপবাস সৃষ্টিকারী হিন্দু বিবাহ বয়স আইন বাতিল করা, প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন না করে সকলের ক্ষেত্রে এক আইন হোক।

—কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম।

নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে রক্ষণাত্মক হওয়ার প্রয়োজন নেই

শ্যামল কুমার হাতি

গুজরাট হিমাচল প্রদেশের নির্বাচন সমাপ্ত। ফলাফলও এসেছে। হিমাচলে কংগ্রেসের জয়লাভ বা বিজেপির পরাজয় নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। সবার নজর ছিল গুজরাটে। সবার নজর নরেন্দ্র মোদীর উপর। বিশেষ করে মিডিয়ার প্রশ্ন ছিল— এর পর মোদীজীর দিল্লী কত দূর? মোদীজীর সমর্থকরা ১০০ শতাংশই চান নরেন্দ্র ভাই মোদী গুজরাট ছেড়ে দিল্লীর রাজপাটের ভার নিক। এতে অসুবিধাও আছে। এখনও আমাদের দেশে অনেক রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব ‘‘হ্যাম কিসিসে কম নেহি’’র মতো। বিপদ সেখানেই। তারপর দেশের যত দুঃখের কারণ কংগ্রেস ও নেহরু পরিবার তারাও কি চুপচাপ বসে? ওরা স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটাকে ক্রমশই অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে গেছে। সরকারে এসে মানুষের সুখের কথা না ভেবে কেবল নিজেদের পকেট ভারী করছে। সেই নেহরুর আমল থেকে জিপ, জাহাজ, সিমেন্ট কেলেঙ্কারী থেকে আজ কমনওয়েলথ, আদর্শ আবাসন, স্পেকট্রাম এবং কয়লাতে এসে দাঁড়িয়েছে। এরা আকাশে স্থলে এমনকি পাতালেও দুর্নীতি করেছে। আজ ধর্ষণ নিয়ে সারাদেশ উত্তাল। সেই নারীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলার নায়ক এই কংগ্রেস দল। এরাই তন্দুর কাণ্ড করেছে। এদেরই নামী নেতা এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অন্যায়ভাবে মহিলার গর্ভে সন্তান এনে পরে তাকে অস্বীকার করেছে। অবশ্য পরে সুপ্রীম কোর্টের হস্তক্ষেপে ওই নেতার আস্ফালন বন্ধ হয়। স্বাধীনতার পর দেশ না গড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী অন্যের বউ-মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানোর মতো কাজ কেবল এরাই করতে পারে। এখন কেউ কেউ বলছে, মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করলে তারা কংগ্রেসকে সমর্থন করবে। বুঝুন অবস্থাটা। সারা জীবন কংগ্রেস বিরোধী রাজনীতি করে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নে ঘৃণ্য কংগ্রেসের হাত ধরতেও তাদের বাঁধবে না। এটাই আজ রাজনীতির সার্বিক চিত্র।

কি দোষ নরেন্দ্র মোদীর? গোধরা কাণ্ডের পর গুজরাটে দাঙ্গা। এটাই দোষ? মোদী বা বিজেপি সরকারে আসার আগে গুজরাটে প্রতি বছর দু—তিনবার দাঙ্গা হোত। কই তার জন্য তো কেউ কখনও কংগ্রেসকে দায়ী করেনি? আজ গুজরাটের সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছেন যে মোদীর সুশাসনে আর গুজরাটে দাঙ্গা হবে না। তাই তো গুজরাটের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত নটি বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে বিজেপি সাতটি স্থানেই জয়লাভ করেছে। মোদীর বিরুদ্ধে সিবিআই, সিটু, কংগ্রেস, কমুনিস্ট থেকে শুরু করে এমনকি তিস্তা আহমেদ শীতলবাদরাও কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। বারবার তারা আদালতে বিফল হয়েছে। গুজরাটের কেউ আর বিজেপি বা আর এস এসকে দাঙ্গার সঙ্গে যুক্ত ভাবে না। নরেন্দ্র ভাই মোদীও দাঙ্গায় ইন্ধন দেননি। এবারের জয়েই গুজরাটের মানুষ ইভিএম মেশিনেই তার বার্তা দিয়েছে। তবে মিথ্যা মোদীর উপর দোষারোপ কেন? এতেও কি মোদী বিরোধীদের চোখ খোলেনি? আরও একটা কথা বিশেষ করে মনে রাখার মতো। তা হলো এবারের গুজরাটের ভোটে তিন বিশিষ্ট ব্যক্তি তিনটে দলের স্তম্ভ ছিলেন। নরেন্দ্র ভাই মোদী বিজেপি, শঙ্কর সিং বাঘেলা— কংগ্রেস এবং কেশুভাই প্যাটেল গুজরাট পরিবর্তন পার্টি। এরা তিনজনই আর এস এসের কাজের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়ে যুক্ত ছিলেন। এদের পুষ্টিলাভ আর এস এসের কাছ থেকে। এরা আর এস এসের দর্শন-এ দীক্ষিত। এটা গুজরাট সমেত সারা দেশই জানে। মজা দেখুন এবারের নির্বাচনে এরা তিনজনই জয়লাভ করেছেন। অন্য দিকে সোনিয়া, মনমোহন এবং রাহুলের হাতে গড়া কংগ্রেসীরা গো-হারা হেরেছে। গুজরাটে কংগ্রেসের পতাকা বইবার মতো কংগ্রেস কালচারের লোক নেই। তাই হয়তো সেই শূন্যস্থানটা কোনও বিহারী ভাই-এর নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছে।

জোট রাজনীতির অনেক বাধ্যবাধকতা আছে। এই সত্যটা অনেকেই জানে। তা বলে বিজেপি-কে রক্ষণাত্মক হওয়ার দরকার নেই। পাড়ার বড় পরিবার যেমন দুদিনের ভাড়াটের কথায় কান দেয় না। তেমনি বিজেপি-ও নিজের বৃহৎ পরিবারের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুক। তাদেরও শক্তি কম নয়। বিজেপির কাছে সঙ্ঘ পরিবার আছে। তার কাছেই আছে দেশের সবচেয়ে বড় শ্রমিক সংগঠন— বি এম এস। আছে ভারতীয় কৃষান সঙ্ঘ। আছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। আছে সরস্বতী শিশু মন্দিরের হাজার হাজার স্কুল, সঙ্গে তাদের অভিভাবকরা। আছে দেশের সবচেয়ে বড় ছাত্রসংগঠন এ বি ভি পি। কে নেই? শুধু পরিবারের দিকে নজর দেওয়া। এই পরিবার একবার একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল, তাতেই ইন্দিরার পরাজয় হয়েছিল। প্রবল পরাক্রান্তা ইন্দিরা গান্ধী রাতারাতি দেশ থেকে ‘জরুরি অবস্থা’ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এটাই হলো সঙ্ঘ পরিবারের শক্তি। মাঝে মাঝে বিজেপি নিজেই নিজের ঘরের দিকে লক্ষ্য রাখে না। বিপদ আসে সেখান থেকেই। এবার সংযমের সঙ্গে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে চলার সময়। পিছনে তাকাবার দরকার নেই। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বিজেপি এগিয়ে চলুক।

সপ্তর্ষির গাওয়া গান মন ভরিয়ে দিল সকলের

বাবার সঙ্গে গানের অনুষ্ঠানে গিয়ে কিছুক্ষণ মন দিয়ে শোনার পর একটু অধৈর্য হয়েছিল সপ্তর্ষি। বাবা বলল, 'আর খানিকক্ষণ বাদে শেষ হয়ে যাবে।' সপ্তর্ষির বয়স চার। বাড়িতে গান গায় শুনে শুনে। পিসি যখন গান গায় সে মন দিয়ে শোনে শুধু নয় কোনও কোনও গান মনে ধরলে চটপট গেয়ে দেয়। পড়তে শেখেনি। কিন্তু নির্ভুল উচ্চারণে আর সুরে গায়। নিজের মনের আনন্দে গাওয়া। তাকে গাইতে বললে সবসময় যে গাইবেই তা নয়। দাদু বলে, 'সপ্তর্ষিবাবু একটু গান শোনাবে?' সপ্তর্ষি বলে, 'শোনাতে পারি একটা জিনিস যদি দাও।' দাদু বলে, 'আইসক্রিম তো?' সপ্তর্ষি মনভরানো হাসির সঙ্গে দাদুকে জড়িয়ে ধরে। দাদু আর নাতির খুশি মুখ দেখে দিদারও হাসিমুখ। সপ্তর্ষি গান শুরু করে। একটার পর একটা গান গেয়ে থামে। বলে, 'খেলতে যাচ্ছি। দাদু ভুলবে না কিন্তু।' দাদু বলে, 'দিদার কাছে থাকবে।'

সেদিন গানের অনুষ্ঠানের শেষদিকে একজন শিল্পী গাইতে শুরু করলেন, 'কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।' দেবজিৎ এই গানটাও শুনতে খুব ভালোবাসে। সেদিনের অনুষ্ঠানের গায়ক গাইছিলেন যত্ন করে। দেবজিৎ লক্ষ্য করল, একটু আগে অস্থির হওয়া সপ্তর্ষি মন দিয়ে গান শুনছে। গায়ক গাইছিলেন, 'এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে।/এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না— মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে।'/এরপর গান এগিয়ে চলে, 'তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি— স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি/জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।'

দেবজিৎ ছেলের দিকে তাকাল। মন দিয়ে শুনছে সপ্তর্ষি। গান এগিয়ে চলেছে, 'এরা কী দেবে তোরে! কিছু না, কিছু না। মিথ্যা কবে শুধু হীনপরানে।।' গানের কথাগুলোর অর্থ হয়তো বুঝছে না সপ্তর্ষি, কিন্তু তার মনের ভালো-লাগা মিশে থাকে। এক মনে শুনছে সুরবদ্ধ কথাগুলো, 'মনের বেদনা রাখো, মা, মনে। নয়নবারি নিবারো নয়নে।।/ মুখ লুকাও মা, ধুলিশয়ানে— ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।।/ শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি দেখো কাটে কি না দীর্ঘ রজনী।/ দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে।'

গানটা থামার পর চুপ করে রইল সপ্তর্ষি। অন্য গানও শুনল। অনুষ্ঠানে শেষে দেবজিৎ ছেলেকে নিয়ে বেরোল। অনুষ্ঠান ছেলের ভালো লাগায় দেবজিৎ নিশ্চিন্ত। নয়তো বাড়ি গিয়ে বলত, 'আজকে বাবা একদম বাজে গানের অনুষ্ঠানে নিয়ে গিয়েছিল।' ছেলেকে নিয়ে একটা নামকরা মিষ্টির দোকানে ঢুকল দেবজিৎ। সপ্তর্ষির পছন্দমতো খাবার এলো টেবিলে। সন্দেশ আর রাবড়ি। বাড়ির জন্যেও কিছু মিষ্টি কিনে নিল ওরা।

বাড়ি ফিরে দিদাকে জড়িয়ে ধরে সপ্তর্ষি বলল, 'দারুণ গান শুনে এলাম।' দিদা বলল, 'হাত মুখ ধুয়ে নাও, খেতে হবে তো। পরে শুনবো অনুষ্ঠানের গল্প।' দেবজিৎ বলল, 'প্রথমদিকে ওর ভালো লাগছিল না শুনতে। পরে মন দিয়ে শুনেছে।' খেতে বসার আগে দিদার সামনে গাইতে শুরু করল, 'কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।' দিদা হাতের কাজ রেখে শুনতে বসে গেলো। দাদুও শুনছে। দেবজিৎ লক্ষ্য করল, একটু আগে শোনা গানটা একমনে গাইছে সপ্তর্ষি। পাশের ঘরে সকলের জন্যে খাবার সাজাতে সাজাতে শুনছিল সপ্তর্ষির মা। গানটার সব কথার মানে বোঝার বয়েস হয়নি। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট উচ্চারণ করে নির্ভুল সুরে। পিসি ওই গানটা গায়নি কখনও। ভাইপোর গলায় শুনে অন্যরকম আনন্দ পায়।

সপ্তর্ষি গেয়ে যায়, 'তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি— স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি/ জ্ঞানধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।'

দাদু বলল, 'খুব ভালো গেয়েছো দাদুভাই, এবার খেয়ে নাও। এই গান কাল তোমার কাছে আবার শুনবো। খেতে বসে অন্য কথা নয়।' সপ্তর্ষির গাওয়া গানটা টেপরেকর্ডারে ধরে নিয়েছিল পিসি। খাওয়ার পরে কয়েকবার বাজাল। দেবজিৎ ভাবছিল অনুষ্ঠান চলার সময় কীভাবে ওই গানটা সপ্তর্ষির মন ছুঁতে পেরেছিল। সুর-তাল-লয় সব সে ধরে নিয়েছিল গানের বাণীসমেত। ছেলে পরে ওই গান আর না-ও গাইতে পারে। ছোটবেলার ভালোলাগা পছন্দ চটপট বদলে যায়। দেবজিৎ ঠিক করল ওই গানটা রয়েছে এমন একটা ডিভিডি কিনে আনবে সপ্তর্ষিকে শোনাবার জন্যে।

দিদা বলল সপ্তর্ষিকে, 'ভালো গান শুনিয়ে আমাদের মন ভালো রেখেছো তুমি। বলো কি চাও তুমি?'

সপ্তর্ষি বলল, 'তোমার আদর আর অনেকগুলো গল্প।'

দিদা বলল, 'তাই হবে দাদুভাই।'

গান্ধর্বী

নবকুমার ভট্টাচার্য

পৌষমাসের এই কনকনে ঠাণ্ডায় এত সকালে নব্বই-উর্ধ্ব বৃদ্ধাকে স্নান করতে দেখে খুব অবাকই হয়েছিলাম। কাশীর কেদারেশ্বর ঘাটে এত সকালে কেউ প্রায় স্নান করেও না, অবশ্য যারা কেদারেশ্বর মহাদেবের ভক্ত তাদের কথা আলাদা। প্রাতঃস্নান করে মস্তকমুণ্ডিত ওই বৃদ্ধা কেদারেশ্বর মন্দিরের দালানে দুপুর পর্যন্ত একান্ত মনে জপ করেন। তারপর সারাদিন হারিয়ে যান কাশীর কোনও এক প্রায়ান্ধকার গলি তস্য গলিতে। কাশীর প্রখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব দ্বিবেদী শাস্ত্রীকে ওই বৃদ্ধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন উনি রুক্মিণী দিদি।

কাশীর রুক্মিণীবাঈকে আজ অনেকেই ভুলে গেছেন। অথচ পঞ্চাশের দশকে তিনি ছিলেন কাশীর একজন নামকরা তয়ফাওয়ালি। বাঈজি হলেও প্রথমজীবনে তিনি ছিলেন একজন দেবদাসী। দক্ষিণ ভারতের এক অখ্যাত গ্রাম থেকে কেবল নিজের সম্মান বাঁচাতেই ছুটে এসেছিলেন বিশ্বনাথের চরণতলে। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসী প্রথা আইনত বন্ধ হলেও বহুদিন পর্যন্ত দেবদাসীরা ছিলেন বহু মন্দিরেই, তবে দেবদাসী হিসেবে নয় সেবিকা হিসেবে। চিদাম্বরমে দেবতার চরণদাসী এক প্রবীণা সেবিকা দত্তক নিয়েছিলেন এক অনাথ শিশুকন্যাকে। নাম দিয়েছিলেন রুক্মিণী। শিখিয়েছিলেন দেবতার সেবা প্রক্রিয়া, নৃত্যভঙ্গিমা, গায়নশৈলী ও শৃঙ্গার মুদ্রার নানা প্রকরণ। মাত্র সাত আট বছর বয়সেই ওই কন্যা হয়ে উঠেছিলেন অনন্যা। সেই বয়সেই নৃত্যের মূর্ছনায় এবং গায়নের বিবশতায় মুগ্ধ করেছিলেন চিদাম্বরম ও মাদুরাই মন্দিরের দেবতা এবং ভক্তদের। তাঁর গায়নের মাধুরিতে মুগ্ধ হয়ে যেত ভক্তরা, আকুল হয়ে কেঁদে উঠত তাদের হৃদয়। কিন্তু দেবতার সেবাপ্রক্রিয়া ছেড়ে সমাজের মারপ্যাঁচে ক্ষমতাসীন পুরুষদের ভোগে ব্যবহৃত হতে চাননি বলেই অশ্রুসিক্ত নয়নে একদিন চলে এসেছিলেন কাশীতে। আশ্রয় নিয়েছিলেন বিশ্বনাথের ছত্রছায়ায়। হয়ে উঠেছিলেন রুক্মিণীবাঈ। মারাঠি ভাষায় 'বাই' অর্থে মা বা বড় বোন আর রাজস্থানীতে বোন। সঙ্গে হিন্দুস্থানি 'জি' যোগ করা হয় সম্ভব জানানোর উদ্দেশ্যে। শব্দের জন্মকথা যে অর্থই বহন করুক না কেন বাঙালি বাঈজীকে মন্দ মেয়ে মানুষ হিসেবেই চিরদিন দেখে এসেছে। বাঈজী বলতে অনেকে ভাবেন বহুবল্লভা, অতএব নিন্দনীয়া। রুক্মিণীবাঈ মন্দ হবার ভয়েই কিন্তু পালিয়ে এসেছিলেন কাশীতে। নিত্য গঙ্গাস্নানে পবিত্র হতেন। কাশীর সেকালের প্রখ্যাত পণ্ডিত দামোদর শাস্ত্রী সহস্র বুদ্ধির কাছে বেদান্ত দর্শনের পাঠ নিয়েছিলেন কিছুকাল। অবশ্য অন্য কোনও আয়ের পথ না থাকায় রোজগারের জন্য নৃত্যগীতকেই পেশা হিসেবে নিতে হয়েছিল। বাঈজী হলেও তাঁর কোনও 'কোঠি' ছিল না। তাঁর অনুষ্ঠান ছিল বেশিরভাগই মন্দিরে মন্দিরে অথবা কোনও সহৃদয় ব্যক্তির বৈঠকখানা বা নাচঘরে নয়— ঠাকুর দালানে।

ভারতনাট্যম্ নৃত্যশৈলীতে কীভাবে প্রভুর আরাধনা করা যায় তা রুক্মিণীবাঈ দেখিয়েছেন। তাঁর গলার স্বরে কাশীর ভজন অন্যমাত্রা পেয়েছিল। তাঁর কণ্ঠে রাবণ বিরচিত শিবতাণ্ডব স্তোত্র ছিল অনন্য।

সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ অমিয়নাথ সান্যাল লিখেছেন, 'বাঈজীরা চরিত্রহীন বলে লোকে ভাবে। কারণ তাঁদের জীবনে অনেক পুরুষের সমাগম ছিল। কিন্তু নাচ-গান করে পয়সার রোজগার— এটা তো একটা প্রফেসন। অনেক মানুষকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করে বেঁচে থাকার তাগিদেই প্রয়োজনীয় অর্থ জোগাড় করেন তাঁরা। এই যে এত বড় বড় বাঈজী, যাঁদের লোকে ঘৃণা করে, আমার মতে তাঁরা, এক একজন গান্ধর্বী।... আসলে এটা আমাদের দুর্ভাগ্য যে, একজন গান্ধর্বীর যে সম্মান পাওয়া উচিত সে সম্মান আমরা দিতে পারিনি।' গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনায় রয়েছে, 'বিবেকানন্দ খেতরীর রাজসভায় উপস্থিত হইলে একজন 'বাঈ' রাজসভায় গান করিতে আসে। বিবেকানন্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষত ওইরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, একখানি গান শুনিয়া যান।' বাঈজী গান ধরিল—

> প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর।
> সমদরশি হ্যায় নাম তোমার।।
> এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়,
> এক রহো ঘর ব্যাধক পরো।
> পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়,
> দুঁহু কাঞ্চন করো।।

সমস্ত গানটির ভাব এই যে— হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নির্গুণ ও ভগবানকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক— যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধ গৃহে লৌহ ও পূজাগৃহে লৌহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নির্মল বারি বা ময়লা-ধৌত নালার জল— গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়। তানলয় গঠিত, ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত সংগীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল— মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন— ''ধিক আমার সন্ন্যাস অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত' 'এ মান্য' আমার বোধ আছে। তদবধি সেই বাঈকে বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতরীতে যাইতেন, খেতরীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন— 'আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।' রুক্মিণীবাঈও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বহু পুণ্যাত্মা সাধুসন্তকে শুনিয়ে গিয়েছেন সুরছন্দে 'শিবমহিম্নস্তোত্র'।

আজ রুক্মিণীবাঈ নেই। রুক্মিণীবাঈয়ের স্মৃতিও হারিয়ে গেছে কাশীর গলি তস্য গলিতে।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

পৌরাণিক নগর উজ্জয়িনী

গোপাল চক্রবর্তী

উজ্জয়িনী প্রাচীন অবন্তি বা মালবের রাজধানী। 'স্কন্ধপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে' কথিত আছে যে ত্রিপুরাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে মহাদেবের জয়লাভের ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য অবন্তি নগরের নাম রাখা হয় উজ্জয়িনী। মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' (পূর্বমেঘ) কাব্যে 'উজ্জয়িনী' 'বিশালা' নামে অভিহিত হয়েছে। সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগরে' এর 'পদ্মাবতী' 'ভোগবতী' এবং 'হিরণ্যবতী' নাম পাওয়া যায়।

উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির

শিপ্রাতটবর্তী সুরম্য নগরী উজ্জয়িনী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী এবং মৌর্যদের সময়ে রাজপ্রতিনিধিদের শাসন কেন্দ্র ছিল। সিংহাসন লাভের পূর্বে রাজা বিন্দুসারের পুত্র অশোক উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটদের দুটি রাজধানী ছিল 'পাটলীপুত্র' ও 'উজ্জয়িনী'। গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভার প্রধান রত্ন কালিদাস সম্ভবত উজ্জয়িনীবাসী ছিলেন। তাঁর 'মেঘদূত কাব্যে'র পূর্বমেঘের বেশ কয়েকটি শ্লোকে বিশালা বা উজ্জয়িনীর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন—

"প্রাপ্যাবর্তীনুদয়নকথা কৌবিদগ্রামবৃদ্ধান্

পূর্বোদ্দিষ্টামনুকর পুরীং শ্রীবিশালাংবিশালাম্।

স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গীণাং গাং গতানাং

শেষৈঃ পুণ্যৈ হৃতামিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্।।"

—(অর্থাৎ বৎসরাজ উদয়ন কথায় অভিজ্ঞ গ্রাম বৃদ্ধদ্বারা আশ্রিত অবন্তিদেশ পেয়ে পূর্ব-নির্দিষ্ট, সম্পদে সৌন্দর্যে মহতী বিশালা (উজ্জয়িনী) নামে নগরীকে অনুসরণ কর। পুণ্যফল ভোগে ক্ষয় পেয়ে অল্প হয়ে গেলে স্বর্গবাসী মানুষদের শেষ পুণ্যটুকু দ্বারা আনীত, পার্থিব মানুষদের ভোগের জন্য স্বর্গেরই কান্তিযুক্ত একটি টুকরোর মতো এই পুরী।)

শিপ্রাতটবর্তী সুরম্য নগরী উজ্জয়িনী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক রাজা চণ্ডপ্রদ্যোতের রাজধানী। প্রদ্যোৎকন্যা বাসবদত্তার সঙ্গে বৎসরাজ উদয়নের প্রণয় কাহিনী অবলম্বন করে ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তম' রচিত হয়েছে। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অবন্তি নামক জনৈক রাজা উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করতেন। পুরাণে রাজা অবন্তিকে যদুকুলের হৈহয় শাখার মাহিষ্মতী নগরাধিপতি কার্তবীর্যার্জুন বংশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে কীর্তবীর্য বংশীয় তালজঙ্ঘ থেকে তালজঙ্ঘকুলের উদ্ভব এবং এর পঞ্চশাখার নাম—ভোজ, বীতিহোত্র, শার্যাত, অবন্তি, তুণ্ডিকের।

এই কিংবদন্তীগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে প্রাচীন অবন্তি জাতির দেশ উজ্জয়িনী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। একসময়ে অবন্তিগণের অধিকার দক্ষিণ নর্মদা নদীর উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্যও উজ্জয়িনী বিখ্যাত ছিল। খৃস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত 'পেরিপ্লিউস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 'ওজেনী' (উজ্জয়িনী) থেকে বরিগাজায় (ব্রোচনগরে) এবং ভারতের অন্যান্য অংশে মূল্যবান পণ্যদ্রব্য রপ্তানী হোত। তিনটি বিশেষ বাণিজ্যপথের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় উজ্জয়িনী বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। শুধুমাত্র আর্থিক নয়, মানসিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও উজ্জয়িনীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধির আর এক কারণ এর 'মহাকাল মন্দির'। সুদূর পৌরাণিক যুগ থেকে বর্তমানযুগ পর্যন্ত এই মহাকাল মন্দির এক সুদৃঢ় যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে।

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য বিষয়ক কিংবদন্তী এবং বিভিন্ন সাহিত্য ও লেখ— গত প্রমাণ থেকে মনে হয় উজ্জয়িনী সেকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার বিশেষতঃ সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য উজ্জয়িনীতে জ্যোতির্বিদ্যারও বিশেষচর্চা ছিল এবং প্রাচীন হিন্দু জ্যোতির্বিদ্ ও ভূগোলবিদ্‌গণ এখান থেকে দ্রাঘিমান্তর স্থির করতেন।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। The History and Culture of the Indian People--R.C. Majumder.

২। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস। ড. হেরম্বচন্দ্র রায়চৌধুরী।

৩। ভারত কোষ (১ম খণ্ড)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

গরিব ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো

হোতুর কাছে জগৎমুরারী সামন্ত প্রস্তাব দিয়েছিলেন ছোটোদের জন্যে কিছু করার। তাঁর ছেলে অল্পবয়সে মারা যায়। একটিই ছেলে ছিল। তাঁর বাড়ির লোকজনের ইচ্ছে 'সম্পদ'-এর স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে কিছু করতে। সম্পদ-এর স্মৃতিই এখন তাঁদের সম্পদ। স্কুল থেকে ফেরার সময় গাড়ির ধাক্কা লাগে। কয়েকদিন না হোক অনেকেই তাকে ভোলেনি। স্কুলের ম্যাগাজিনে সম্পদকে নিয়ে লিখেছিল তিনজন। অল্প বয়সে মৃত্যুর আঘাত মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কেটে যায়।

স্কুলের বন্ধুরা পড়াশোনা করে বড়ো হয়েছে। চেহারায় বড়ো, মনেও বড়ো। অনেকরকম কাজ করছে সকলে।

জগৎমুরারী কাজের ব্যস্ততায় সব কষ্ট অনেকটা ভুলে থাকেন। কিন্তু সম্পদ-এর মায়ের যন্ত্রণা কত বেশি তা বুঝতে পারেন। সম্পদ-এর স্মৃতিজড়ানো সবকিছু যত্নে রাখা আছে। দশটা বছর পেরিয়ে গেছে। অথচ মনে হয় এই সেদিন। এমনই হয়ে থাকে।

হোতু চিনত সম্পদকে। সেও যথেষ্ট আঘাত পেয়েছিল। পারিবারিক শোক

হাসপাতালে লড়াই চালিয়েছিল। হাসপাতালে ডাক্তার নার্স সকলে খুব চেষ্টা করেছিলেন সম্পদ-এর জীবন রক্ষা করতে। শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করলেন তাঁরা। সম্পদ-এর মৃত্যুর পর হাসপাতালের সকলে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। স্কুলের ছাত্র-শিক্ষকদের মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সম্পদ ক্লাস নাইনে পড়ত। ওর ক্লাসের বন্ধুরা দল বেঁধে বাড়ি এসেছিল। তাদের দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন সম্পদের মা। সকলকে আঁকড়ে ধরে বলেছিলেন, 'তোমরা ভালো থেকো বাবা।' কাঁদছিল সম্পদের বন্ধুরাও।

সব শোকের ব্যথাই কিছুদিনের মধ্যে কমে যায়। সম্পদকে হারানোর কষ্ট তার বাবা মায়ের পক্ষে ভোলা কঠিন। কিন্তু সময় ভুলিয়ে দেয় সময়ের তাগিদে। এটাই জীবনের নিয়ম। সম্পদের বন্ধুরা সকলে সম্পদের ছবিটার বয়স বাড়েনি। স্কুল-পোষাক পরা ছবিটা স্কুলেও টাঙানো রয়েছে। অনেকের মনেও রয়ে গেছে।

জগৎমুরারী ব্যবসায়ী মানুষ। ছেলের স্মৃতি আগলে রেখেছেন। নিজের কাজে মন দিয়েছেন। ছোটোদের জন্যে ভাবেন সবসময়। নিজের ছেলে থাকল না। অনেক ছেলের মধ্যে সম্পদকে খুঁজে নিতে চান। সম্পদের মা একটা স্কুলে পড়ান। সেখানে তিনি নিজের অন্য জগৎ খুঁজে পান। ছাত্রীদের কাছে তিনি প্রিয় দিদি। সকলকে স্নেহে ভালোবাসায় ভরিয়ে দেন। বছরে দুবার সকলকে বই উপহার দেন। একবার নতুন ইংরেজি বছরে, আরেকবার পঁচিশে বৈশাখের সময়। সম্পদের মা শাশ্বতী রবীন্দ্রনাথের গান মাঝে মাঝে শোনান। অনেক সময় মনে হয় গানের ভিতর দিয়ে সান্ত্বনা খুঁজে পান।

আস্তে আস্তে সয়ে যায়— এটাই নিয়ম। সম্পদের বাবা-মা যেভাবে ছেলের স্মৃতি ধরে রাখতে চায় রাখুক। সেটাই মূল্যবান। কোনওকিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। যা স্বাভাবিকভাবে আসে তাই-ই ধরা থাকুক।

হোতু বলল, 'ছোটোদের আপনারা ভালোবাসেন। তাদের জন্যে যা যা করছেন করুন। তার সঙ্গে একটা কাজ সম্ভব হলে করতে পারেন। দুটো স্কুলের কুড়িটা করে চল্লিশটা ছেলেমেয়েকে বেছে নেওয়া যেতে পারে যাদের পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়। অথচ পড়াশোনার ইচ্ছে আছে। তাদের জন্যে কিছু করলে তা সত্যিকারের কল্যাণ কাজ হয়ে উঠবে। প্রতিবছর ওইভাবে চল্লিশটা ছেলেমেয়েকে বেছে নিলে ভালোই হবে।' জগৎমুরারী রাজি হলো হোতুর প্রস্তাবে।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

দীপনের পড়ার অভ্যেস

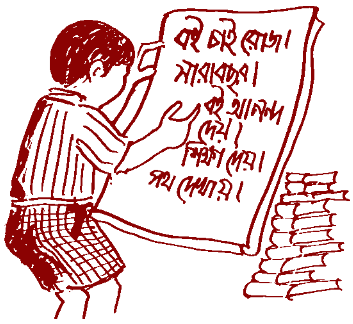

পোস্টারটা পড়ল দীপন। বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা : 'বই চাই রোজ। সারাবছর। সুখে-দুঃখে, অসময়ে-সুসময়ে। ছাপা শব্দ সকলের জন্যে। কিন্তু পড়তে পারে না বহুজন। বই আনন্দ দেয়, শিক্ষা দেয়, পথ দেখায়। 'আমি পড়ি না' বলা সহজ। 'আমি পড়ি' বলা কঠিন। 'পড়ার ব্যাপারে ফাঁকি চলে না।' তাপস-স্যার বলেন, 'রোজ একটু একটু করে পড়লে অনেকটা পড়া হয়ে যায়। বছর শেষে কম নয়।' দীপনের বই পড়ার ইচ্ছেটা আগে কম ছিল। টেলিভিশনে নানারকম জিনিস দেখে মজা পেত। বাড়িতে অনেকেরই পড়ার অভ্যেস রয়েছে। বাবা কোনওদিন জোর করেনি পড়ার ব্যাপারে। স্কুলের পড়াশোনা ভালোই করে। খেলাধুলোয় অংশ নেয়। ছবি আঁকে। গান গায়। ক্লাসের অরিত্র অনুপম দিবাকর সুরঞ্জন অধীপ অনেকরকম বই পড়ে। মনেও রাখতে পারে। কিছুদিন আগে দীপনের চোখের কি একটা সমস্যা হয়েছিল। ভালো দেখতে পাচ্ছিল না, কষ্ট হচ্ছিল। ডাক্তারকাকু জিগ্যেস করলো, 'খুব টেলিভিশন দেখো?' দীপন স্বীকার করল। ডাক্তারকাকু বলল, 'কম দেখবে। বই পড়ো। চোখের কষ্ট কম হবে।' সেই থেকে দীপন বইকে বন্ধু করেছে। টেলিভিশন দেখা কমে গেছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. গুজরাটের রাজধানী কোথায়? প্রধান ভাষা কি? প্রধান ধর্ম কি?
২. পোরবন্দরে কার জন্মস্থান?
৩. গুজরাটের জাতীয় উৎসব কি? কোন্ সময়ে হয়?
৪. বিখ্যাত নাচ কি? ঘুড়ি উৎসব কবে হয়?
৫. রবীন্দ্রনাথ 'ক্ষুধিত পাষাণ' লেখার প্রেরণা পান কোথায় গিয়ে? এখন সেখানে কি আছে?

উত্তর : ১. গান্ধীনগর (আমেদাবাদ)। গুজরাটি। জৈন, হিন্দু। ২. মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ৩. নবরাত্রি। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। ৪. গরবা। মকরসংক্রান্তিতে। ৫. শাহীবাগ প্রাসাদ। বল্লভভাই প্যাটেল স্মারক সংগ্রহশালা।

ছবিতে তফাত খোঁজা

উলটো পালটা

সুমিতা দিনে দিনে মোটা হয়ে যাচ্ছে— এটা একটা সমস্যা বাড়ির সকলের কাছে। অল্প বয়েস। এত ওজন বাড়া ঠিক নয়। একদিন সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারকাকুর কাছে গেলো। ডাক্তারকাকু অনেকক্ষণ কথা বললেন। তারপর ঠিক করে দিলেন কতটা পরিমাণ রোজ খাবে। দুটো রুটি, এক কাপ ভাত, একটু ফল সেই সঙ্গে আরও কিছু। সুমিতা জিগ্যেস করল, 'এগুলো কি আমি খাওয়ার আগে, না পরে খাব?'

২

শান্তিপ্রিয় সামন্ত মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। সে খুন করেছে অনেক। অবশ্য তাকে ভাড়াটে খুনি হিসেবে কাজে লাগিয়েছে কেউ কেউ। আদালতে তাকে হাজির করা হলো। বিচারক তাকে জিগ্গেস করলেন, 'এতগুলো খুন করতে পারলে?' শান্তিপ্রিয় বলল, 'হ্যাঁ, আমি ছ'জনকে খুন করে থেমে গিয়েছিলাম। কাজটা ভালো হচ্ছিল না বলে।'

বিচারক বললেন, 'তুমি আরও একটা খুন করলে? যাকে খুন করলে সে তো একজন নিরীহ বৃদ্ধ।' শান্তিপ্রিয় বলল, 'ভেবেছিলাম সাত খুন হলেই সব মাফ হয়ে যায়।'

৩

স্কুলে দিলীপ-স্যার প্রশ্ন করলেন, 'বিশিষ্ট ব্যক্তি কাদের বলা হয়?' রণিত উত্তর দিল সঙ্গে সঙ্গে, 'যাঁরা অন্যকে বিষ দিয়ে নিজেরা শিষ্ট হয়ে বসে থাকেন।'

রামগরুড় সংকলিত

নারী মুক্তির অন্য দিক

(২য় পর্ব)

এষা দে

পৃথিবীতে অর্ধশতাধিক মুসলিম দেশ আছে, তার মধ্যে দুটি দেশ ঘুরে দেখা সৌভাগ্য হয়েছে, সে দুটি হলো— মিশর ও তুরস্ক। আর্থিক- সামাজিক বিকাশের দিক থেকে দুটি দেশই অগ্রণী রাষ্ট্র। মিশরীয় ট্রাভেল সংস্থার সঙ্গে যখন মিশরের দ্রষ্টব্য দেখেছি, তখন লক্ষ্য করেছি, ওদেরই একজন মহিলা কর্মী ন্যূরকে। তার পোশাকে লক্ষ্য করলাম নিচে প্যান্ট, ওপরের আবরণ শার্ট-কামিজ মেশানো, মাথায় হেডস্কার্ফ বা হিজ্বা আর একটা টিউনিক। খুবই সুন্দরী। ওখানকার ‘বেলি ডান্স’ নীল নদের ওপরে বজরাতে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। আমাদের গ্রুপের সকলের চেয়ে বলিষ্ঠ ছিল সে। রাত বারোটায় শেষ হলো। আমাদের বিশাল বিশাল স্যুইটে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু থাকা নিয়ে একটা সমস্যা হওয়ায় রাত্রিবেলা ওকে ডেকে পাঠানো হয়। ওই রাতে মেয়েটি এল। সমস্যার সমাধান করে রাত তিনটের সময়ে সে বাড়ি গেল। পরদিন সব দেখার পর একটা পার্কে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি— মিশরে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে। জানা গেল, মিশরে নারীশিক্ষা খুবই অগ্রণী উনিশ শতকের সময় থেকে। সেই সময়ে মহম্মদ আলি ছিলেন সর্বেসর্বা। তিনি সাধারণভাবে তুর্কি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ইউরোপীয়ান মনস্ক ছিলেন। সংস্কারের কাজে তাঁর পদক্ষেপেই পরবর্তী উত্তরাধিকারীরাও নানারকম সংস্কারের কাজে মন দেয়। নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েরা এগিয়ে গেছে অনেকটাই। বিংশ শতাব্দীতে নারীরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অবরোধ থেকে বাইরে আসেন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে। ১৯১৯-এ বৃটিশ-বিরোধী বিপ্লবে ১৬ মার্চ নারীদের প্রকাশ্য অভ্যুত্থান হয়। তাঁরা নিপীড়নের শিকার হন। ১৬ মার্চ দিনটি ওদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্মরণীয় দিবস। নাসেরের সময়ে নারীদের শিক্ষা ও আর্থিক অবস্থায় এত উন্নতি

‘মেয়েদের সর্বশরীর আবৃত রেখে বাইরে বেরোতে হবে’— রাষ্ট্রীয় ফতোয়ার বিরুদ্ধে আংকারায় তুরস্কীয় মহিলারা বিক্ষোভে সামিল।

হয়েছিল যে, বলত লোকে রাষ্ট্রচালিত নারীবাদ। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে। অনেক ইউরোপীয় দেশের চেয়ে বেশি সংখ্যায় তারা এগিয়ে থেকেছে। পূর্ব ইউরোপের তুলনায় অনেক অগ্রণী ছিল। খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, মিশরে বাল্যবিবাহ নেই। ওদের দেশে কুড়ি বছরের কমে বিয়ে প্রায়ই হয় না। আমাদের ট্রাভেল এজেন্সির মেয়েটি ন্যূর এতই বলিষ্ঠ যে, সেও সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে যে বিয়ে করবে না। ওদের দেশে অবিবাহিত হিসেবে থাকার নিরাপত্তা আছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বোরখা পরা বা হেডস্কার্ফ পরা প্রচলিত নয়। বাধ্যতামূলক নয়ই। হিজ্বা বা হেডসার্ফ পরা অনেকটা ফ্যাশনের অঙ্গ। এখানকার মেয়েদের পোশাক হিসেবে দেখা গেল ফুলস্লিভ জামা। এ দেশের মহিলারা পুরুষের অধীনতায় আসতে চান না কারণ, ওদের মধ্যে আছে তালাকের ভয়। উচ্চশ্রেণীর মিশরীয়রা ইউরোপীয়ান হয়ে গেছে। নীচুশ্রেণীর মিশরীয়দের সঙ্গে যোগ নেই। ওদের দেশে মেয়েদের বিয়ের প্রতি অনিচ্ছুক মনোভাব দেখা গেল। পুরুষের তালাক হলো একচ্ছত্র অধিকার ও স্বেচ্ছাচারী মনোভাব। কিন্তু মেয়েরা স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। ওখান থেকে ঈইজিপ্টের অন্যপ্রান্তে আসোয়ান ড্যাম দেখলাম। মরুভূমি। সেখানে আবার চোখে পড়ল কৃষ্ণাঙ্গ বোরখাপরা মহিলা। দরিদ্র শ্রেণীর নারী। ওখানকার মেয়েরা সম্ভবত বেশি কনজারভেটিভ। ও আরেকটা কথা, মিশরে বর্ণভেদ আছে বলে মনে হলো। কায়রোতে উচ্চশ্রেণী যত দেখলাম গৌরবর্ণ, এখানে তত নয়। তার মানে উচ্চশ্রেণীর মানুষ গৌরবর্ণ আর নিম্নশ্রেণীর মানুষ কৃষ্ণবর্ণ। মিশরীয় সভ্যতার যে পুরুনো কালচার তাতে আছে এশিয়ান সভ্যতার প্রভাব। কায়রোর নাগরিক জীবন ও গ্রামগঞ্জের জীবনযাত্রায় অনেক তফাত। এখানে নারীপুরুষ খেটে খায়। এদের পোশাক-পরিচ্ছদে রয়েছে সনাতনী ছাপ। আধুনিকতার তকমা এদের পোশাকে পড়েনি। মেয়েরা যেমন বোরখা পরছে, পুরুষেরা পরছে আপাদলম্বিত জেলাবিয়া অর্থাৎ ঢোলা পোশাক। তুরস্ক পশ্চিমবঙ্গের দশ গুণ বিশাল দেশ। তারা দাবি করে তুরস্ক ইউরোপের অংশ। তিন শতাংশ ইউরোপে, সাতানব্বই শতাংশ এশিয়ায়। ওরা মনে করে ইউরোপীয় সভ্যতা থেকেই ওদের উৎপত্তি। তুরস্ক নাম আধুনিক। কিন্তু তুর্কিরা এসেছিল মধ্যএশিয়া থেকে। ওরা দেশ জয় করে এখানে বসবাস

করতে শুরু করে। ১৪৫৩-র শেষ যুদ্ধে তারা কর্তৃত্ব পায়। তার আগে অর্থাৎ মুসলমান-দেশ হওয়ার আগে একশো-শতাংশ খৃস্টান দেশ ছিল। গ্রিকভাষী খৃস্টধর্মাবলম্বী বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। তুরস্ক হলো অটোমান সাম্রাজ্য। পরে ধীরে ধীরে খৃস্টানধর্ম লুপ্ত প্রায় হয়। পাঁচ শতাংশ খৃস্টান অবশিষ্ট মনে করা হয়।

আধুনিকতার আন্দোলন উনিশ শতকে শুরু হয়। সুলতানরা ভেবে দেখলেন যে, নিজেদের না পাল্টালে হবে না। তাঁরা তখন ইউরোপের সাহায্যে আধুনিক হতে শুরু করেন। সেই থেকে মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি হয়। সেই সময়েই কামাল আতার্তুকের আবির্ভাব। তিনি ছিলেন একদিকে সেনাপতি, এক নায়ক এবং দুর্দান্ত সমাজ সংস্কারক। তিনি বুঝেছিলেন— নারীদের স্বাধীনতা না থাকলে দেশের উন্নতি হবে না, তিনি শরিয়ত তুলে দিলেন। নারীশিক্ষায় উৎসাহ দিতে শুরু করলেন তো বটেই; সরকারি প্রতিষ্ঠানে বোরখা বা হিজ্জা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ওখানে যখন গেলাম, দেখলাম তুর্কি নারীরা সমাজে সবরকমের পেশায় আছেন। এখানেও বাল্যবিবাহ নেই। ইস্তানবুল এখানকার সবচেয়ে বড় শহর। কোনও বোরখা বা হিজ্জা পরিহিতা নারী দেখিনি। পোশাক-আশাকে ইউরোপীয় প্রভাব। আমাদের ট্যুর ডিরেক্টর বললেন, মেয়েরা এখানে পুরুষদের চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে। অনেক সফল। তবে এখানে কর্মরতা নারীর সন্তান পালনের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশের মতো ক্রেশ, শিশুদের সংস্থা নেই। রাষ্ট্রীয় সাহায্য পায় না। তবে এখানে পারিবারিক ব্যাপারটা আছে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ। সন্তানসংখ্যা কমের চেষ্টা করা হয়। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের অবসরের বয়স অনেক কম। কেননা তারা মনে করে তারা নাকি পুরুষের আগে বুড়িয়ে যায়। ইস্তামবুলের সমাজ আর গ্রামের সমাজের মধ্যে অনেক তফাত। তারা আতার্তুকের ব্যাপারটা অর্থাৎ সংস্কারের ব্যাপারটা সর্বান্তঃকরণে হয়তো মানতে চায় না। অথচ একেবারে যে অন্ধকারে তা নয়, গ্রামেগঞ্জে তারাও অনেক এগিয়ে। এখানে মেয়েদের গায়ের রঙ ফর্সা। তবে হ্যাঁ, ঘরে ঘরে বিবাহ বিচ্ছেদ। তুর্কিভাষী স্কুলের পাশাপাশি ইউরোপীয়ান স্কুলও আছে।

মিশর ও তুরস্কে একটা ব্যাপারে সাদৃশ্য এটাই যে, বিয়ে ব্যাপারটা মেয়েদের ক্ষেত্রে ভাবা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। ওরা মনে করে, বিয়ে দিলে জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঘরের বাইরে কাজ করার সুযোগ হারাবে। যদিও সনাতন সমাজে বিয়ে দেওয়া বাবা-মায়ের কর্তব্য। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বাবা-মারাও মেয়েদের বিয়ে দিতে চান না। আমাদের ট্যুর ডিরেক্টরের মেয়ে বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। তার বিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গ তুললে উনি কিছুটা বিরক্ত হতেন তা প্রকাশ পেত। বিয়ের ব্যাপারে মহিলাদের যে ক্ষোভ তা সমাজ বা রাষ্ট্রের পক্ষে ক্ষতিকর। তুরস্কে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখলাম, একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাব দেখা যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে মৌলবীরা কিন্তু সনাতন প্রথার প্রচার করছে। এক্ষেত্রে বিপরীতমুখী মনোভাবও দেখা যাচ্ছে। গণতন্ত্রে মানুষ সকলের জন্য পুরনো প্রথায় ফিরে আসতে চায়। তুরস্কে লোকসংখ্যা অনেক কম, কিন্তু পুরনো ধ্যানধারণাকে ওরা পেরিয়ে আসতে পারছে না। আবার আতার্তুক যে সমাজসংস্কার চেয়েছিলেন, তা সমাজ সবদিক থেকে মেনে নিতে পারছে না। মেয়েরা স্বাধীন, সমাজও শিক্ষিত, কিন্তু তবুও আবার পুরনো প্রথায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রতিবাদ করছে, এমনকি আত্মহত্যাও করছে। সুতরাং এটাই সত্য যে, নারীকে স্বাধীনতা দিলেই যে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে এমনটা নয়। বরং এতে রাষ্ট্র ও সমাজের ক্ষতি হচ্ছে। শান্তির অভাব হবে। নারীমুক্তি আন্দোলন রাষ্ট্র চেষ্টা করলেও সমাজ রাজি হয় না। সামাজিক দিক থেকে তাকে স্বাগত জানায় না। ফলেই সেই সনাতন যুগেই ফিরতে চায়। এ যেন সেই খাঁচার পাখির গল্পটা। খাঁচার বাইরে তাকে আনলেও সে আবার খাঁচার মধ্যে ফিরে আসে। নারীরাও সামাজিক প্রভাবে স্বাধীনচেতা হয়েও পুরনো প্রথায় ফিরে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে।

অনুলিখন : ইন্দিরা রায়

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

Sharada Travels

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

ভ্রমণ	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য		
			প্রাপ্তবয়স্ক	বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর	শিশু ২-৪ বৎসর
উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা)	১২	১৫ই মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ)	১২	২৮শে মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
গ্যাংটক-নামচি-পেলিং	৮	১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩	৭,০০০/-	৫,৫০০/-	২,০০০/-
দার্জিলিং-গ্যাংটক	৮	২৩শে মে,২০১৩	৬,৮০০/-	৫,১০০/-	১,৭০০/-
সিমলা-কুলু-মানালী	১১	৯ই মে,২০১৩	৯,৫০০/-	৭,৩০০/-	২,৪০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং।

প্যাকেজে থাকছে না :- এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজ ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়লেও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অর্থনীতি ধ্বংস হচ্ছে

অতিথি কলম

ভরত ঝুনঝুনওয়ালা

সরকার পুনরায় গমের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। এই বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাবে। ভারতীয় খাদ্য নিগমের হাতে গত বছরের বিশাল শস্য উৎপাদনের সংরক্ষণের যথেষ্ট জায়গা ছিল না। সমস্যা আরও বাড়বে বর্তমান এবং আগামী বছরগুলিতে যদি আরও ব্যাপক হারে শস্য উৎপাদন হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদন উরোত্তর বৃদ্ধি পেলে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে আরও বেশী জায়গার প্রয়োজন হবে। উৎপাদন শিল্পের রূপ লাভ করতে পারবে না যদি শিল্পজ সামগ্রী অধিককাল গুদামবন্দি করে রাখা হয়। সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গুদামবন্দি সামগ্রীর গুণগতমানের অবমূল্যায়ন হবে। তাই শস্য উৎপাদন না বাড়িয়ে উৎপাদন হ্রাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ। গমের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম খাটে। সুতরাং প্রয়োজনের তুলনায় অধিক উৎপাদন করে তা গুদামজাত করে না রাখাই ভাল।

আরেকটা বড় সমস্যা হলো অধিক উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য কমিয়ে দেবে আর এতে কৃষকদের লোকসান হবে। এটা প্রায়ই ঘটে থাকে যখনই খাদ্য নিগম গম না কেনে। ফড়েদের হাতে কমদামে তখন কৃষক গম বেচতে বাধ্য হয়। সরকারের ঘাড়ে ডিজেল, বিদ্যুত, সার প্রভৃতির ভর্তুকির বোঝা বাড়ছে। তাই বর্ধিত উৎপাদনের অর্থই হলো অধিক হারে এইসব সামগ্রী প্রয়োগ আর যার নীট ফল হলো সরকারের ভর্তুকি বোঝার বৃদ্ধি। দীর্ঘমেয়াদি কৃষজ উৎপাদন কমছে। ভূ-নিম্নস্থ জলস্তর ক্রমশ নামছে দ্রুতহারে। 'কৃষ্ণ ব্লকের' সংখ্যা বাড়ছে যেখানে অবাধে যথেচ্ছ ভূ-গর্ভস্থ জল তোলা হচ্ছে। ১৯৮৯ সালে যেখানে ২৫৩টি এরকম ব্লক ছিল তা ১৯৯৯-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২৮-এ। ক্রমাগত অধিকমাত্রায় রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে জমির জৈব অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে এবং পরিণামে জমির উপযোগী জীবাণু প্রজননে কোপ পড়ছে। এর ফলে জমির উর্বরতা কমছে এবং সেই উর্বরতা বাড়াতে অধিকমাত্রায় সার ব্যবহারের ফলে জমির চরিত্র-ই সম্পূর্ণরূপে বদলে যাচ্ছে।

রাজ্যে রাজ্যে বিদ্যুৎপর্ষদগুলি অর্থের অভাবে ভুগছে আর সরকারি খাজানা খালি হয়ে যাচ্ছে কেবলমাত্র ভর্তুকি আর নিঃশুল্কে বিদ্যুৎ সরবরাহের ঠেলায়। আর এসবের ফলশ্রুতি হলো আর্থিক ক্ষতির বৃদ্ধি যার জেরে আন্তর্জাতিক সংস্থা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওরের ভারত সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। এই নিম্নগামী মূল্যায়ন অর্থনীতির ওপর প্রভাব ফেলছে। এই বিচারধারার গ্রহণীয়তা অবশ্যই থাকত যদি আমাদের দেশের মানুষ অভুক্ত থাকত। কিন্তু শুধু শুধু উৎপাদন বাড়িয়ে তা গুদামবন্দি করার পিছনে কোনও যুক্তি কাজ করে না।

একটা সুপারিশ কার্যকর করা যেতে পারে তা হলো গণ বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার নীচে এবং ওপরের মানুষদের কোটা বৃদ্ধি করে খাদ্যশস্যের বন্টনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে আর এতে গুদামগত খাদ্যশস্যের ভাণ্ডারের পরিমাণও হ্রাস পাবে। এতে অবশ্য খুব একটা সুরাহা হবে না। খাদ্য নিগম থেকে নির্গত অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের সঙ্গে বে-সরকারি স্তরে বর্ধিত গুদামজাত খাদ্যশস্যের মধ্যে একটা ভারসাম্য রাখতে হবে এবং এতে বাজারে চাহিদা কমবে। গৃহিণীরা খোলা বাজার থেকে কম কিনে বেশি মাত্রায় সরকার নিয়ন্ত্রিত খাদ্য নিগম থেকে কিনবে যদি জোগানের প্রাচুর্য থাকে। সামগ্রিকভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় খামতি দেখা দেবে।

দ্বিতীয় সুপারিশ হলো মানুষকে মাংসাহারী করে তোলায় উৎসাহ প্রদান অবশ্য ভুল দিশায় পরিচালিত করা। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উষা পট্টনায়েকের মতে প্রতি কেজি ভেষজ বস্তু গ্রহণের ফলে ২৪.১৫০ ক্যালরি তাপ উৎপাদিত হয়। সেখানে ১ কেজি মাংস গ্রহণ করে একজন মানুষ

খাদ্যশস্য উৎপাদন উরোত্তর বৃদ্ধি পেলে তার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে আরও বেশী জায়গার প্রয়োজন হবে। উৎপাদন শিল্পের রূপ লাভ করতে পারবে না যদি শিল্পজ সামগ্রী অধিককাল গুদামবন্দি করে রাখা হয়। সুদের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে গুদামবন্দি সামগ্রীর গুণগতমানের অবমূল্যায়ন হবে। তাই শস্য উৎপাদন না বাড়িয়ে উৎপাদন হ্রাস করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

১.১৪০ ক্যালরি তাপ নেয়। অন্য কথায়, এছাড়া মাংস সাধারণত ধনীদের খাদ্য। আর এতে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছে। গরীব মানুষরা ভুগছে ক্রমাগত ভূ-নিম্নস্থ জলস্তরের অবক্ষয়ের জন্য।

আরেকটা সুপারিশ হলো অতিরিক্ত খাদ্য রপ্তানি করা। এটাও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে ধনীরা আরও ধনী হলেও দেশের কোনও লাভ নেই। এর ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাব এবং ভর্তুকি ছাঁটাই কমবে না। বাস্তবিক আমাদের সরকার বাহাদুর বাইরের মানুষকে কম দামে খাদ্য সরবরাহ করতে আম-জনতার ওপর কর চাপাতে চায়।

চতুর্থত, নগদ মূল্যের শস্য যেমন ইক্ষু, আঙুর, ফুল, রেশম এবং বায়োডিজেলের উৎপাদনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যদিও এতেও সমস্যার সুরাহায় আশু সন্ধান মিলবে না। এইসব কৃষিজ উৎপাদকের জন্যও লাগামহীনভাবে ভর্তুকির বোঝা বাড়বে সরকারের ওপর। ডিজেল, বিদ্যুত, সারের মতো সামগ্রীর ভর্তুকির লাভ নেবে ধনীকৃষকরা। ভূ-নিম্নস্থ জলস্তর, জমির স্বাস্থ্যের অবনতি অব্যাহত থাকবে। বাস্তবিক অর্থে এইসব নগদ মূল্যের ফসলগুলির জন্য অধিকমাত্রায় জলের প্রয়োজন এবং অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটবে। এতে অবশ্য আরেকটা সুবিধা আছে কৃষকদের এবং তা হলো এই সব ফসলে তারা অধিকমূল্য পেয়ে থাকে।

দেশের মূলস্রোতের অর্থনীতিবিদদের এইসব সুপারিশ গ্রহণীয় নয়। কারণ তিনটি সমস্যা যথা অসাম্য, ভূমিক্ষয় এবং জলস্তরের অবনমনের ফলে সরকারি ভর্তুকির বোঝা ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। আমার সুপারিশ হলো সরকার এইসব ভর্তুকি তুলে দিক। তাহলেই উৎপাদনের হার নিম্নগামী হবে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থায় উন্নতি হবে। তাহলে এর ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন মূল্য বাড়বে। বর্ধিত মূল্যে কেনা শুরু হবে। বর্তমানে প্রতি কেজি গমের উৎপাদন মূল্য যেখানে ১০ টাকা সেখানে বিক্রি হচ্ছে ১২ টাকায়। এতে হয়তো উৎপাদন মূল্য বেড়ে হবে কুড়ি টাকা। সেখানে খাদ্য নিগম কৃষকদের থেকে কিনবে ২৫ টাকায়। এই সুবিধা কৃষকদের আরও ডিজেল ব্যবহার, সার ব্যবহার উৎসাহিত করবে। ভর্তুকির টাকা বাঁচিয়ে সরকার তা বিলি করবে জনসাধারণের মধ্যে নগদ অর্থের মাধ্যমে। এই বন্টিত অর্থে শস্য ক্রয় করতে মানুষের আর বেগ পেতে হবে না।

ভর্তুকি বাঁচানো অর্থের মাধ্যমে কৃষকরা আরও উদার হস্তে ব্যয় করতে পারবে। ক্ষেত্রের চারধারে গাছ লাগানোর অর্থের সংস্থান হবে। এইভাবে কৃষকরাও এই ফসলও ঘরে তুলতে পারবে কাঠ বেচে, ফল বেচে। উপলব্ধ অর্থে অনুর্বর জমিতেও ফসল ফলাবে। এমন বন্দোবস্তের সুফল এক দশকের মধ্যেই পাওয়া যাবে। এইভাবে জমির, স্বাস্থ্য উদ্ধার হবে এবং রসায়নজনিত রোগ থেকে মুক্ত হতে পারবে।

গম উৎপাদন বৃদ্ধি কৃষকদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ, সাধারণ মানুষ এবং ভূমির পক্ষে এক সুবর্ণ উপায়। অথচ মনমোহন সিং সরকারের চিন্তাধারা বিপরীতমুখী যা রপ্তানি নির্ভর।

নেত্রদান মহাদান

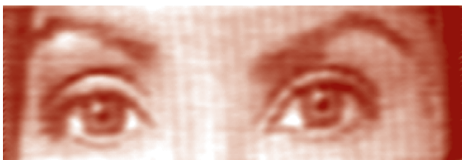

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

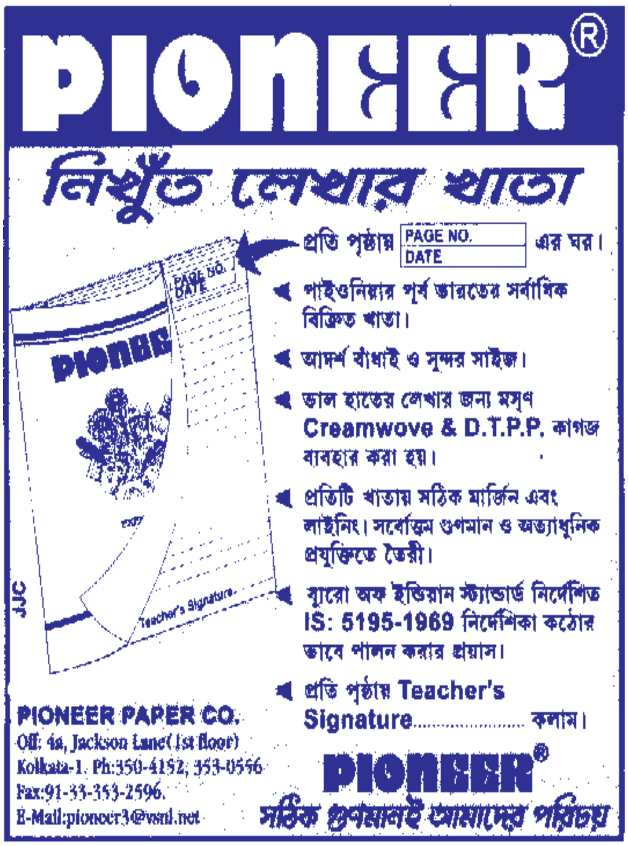

মালদার বিভিন্ন গ্রামে 'লাভ জেহাদ' চলছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : মালদা ॥ মালদা জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে হিন্দু মেয়েদের প্রলোভন ও ভালবাসার অভিনয় করে এবং প্রয়োজনে জোর করে হিন্দু ছাত্রীদের তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করার প্রবণতা বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্রীদের যেমন লাভ জেহাদের মাধ্যমে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে হচ্ছে তেমনি সাধারণ শ্রমিকরা পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কাজ করতে গিয়ে হিন্দু মেয়েদের বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আসছে। এই রকম হিন্দু মেয়েরা মুসলিমদের বাড়িতে চলে এসে বাধ্য হয়ে মুসলিম ধর্ম পালন করছে। বাইরের মেয়েদের বউ করে আনার? সংখ্যাটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কালিয়াচক, সুজাপুর, বৈষ্ণব নগর, চাঁচলের বিভিন্ন গ্রামে গেলেই হিন্দু মেয়েদের আচার আচরণ এবং কথাবার্তাতেও ধরা পড়ছে। তারা হিন্দু ছেলে ভেবেই বিয়ে করেছে। কিন্তু এখানে এসে তারা দেখতে পায় পরিবারটি মুসলিম। গত ১ মাস আগে কালিয়াচক থানার সুজাপুরের এক নাবালিকা ছাত্রীকে এক মুসলিম যুবক তার সঙ্গীদের সঙ্গে জোর করে মেয়েটির দাদুর বাড়ি ধুলিয়ান থেকে তুলে নিয়ে যায়। পুলিশ প্রশাসনের কাছে দৌড়া দৌড়ি করেও এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। পায়েল মণ্ডল নামে দ্বাদশ শ্রেণীর এই ছাত্রীটি সুজাপুর হিন্দু পাড়াতে থাকত। মাঝেমধ্যেই সুজাপুরের কাছে গয়েশবাড়ি বসনি টোলার ওসমান গনি (২১) তাকে উত্যক্ত করত এবং মোবাইলে ছবি উঠিয়ে জ্বালাতন করত। সুজাপুরে ৯০ শতাংশ মুসলিমদের বসবাস। মেয়েটির বাবাকেও ছেলেটি হুমকি দিয়েছিল এবং বলেছিল 'আপনার মেয়েকে পাতালে রাখলেও সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাব।' মা-বাবা বাধ্য হয়ে পায়েলের বিয়েও ঠিক করেছিল।

কিন্তু শেষরক্ষা হলো না। গত ২৭ ডিসেম্বর মেয়েটির মামার বাড়ি থেকে মুখ বেঁধে ট্যাক্সিতে করে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কালিয়াচক থানা ও ধুলিয়ান থানা দুই জায়গাতে এবং মুর্শিদাবাদ ও মালদার এস পি-র কাছে বার বার আবেদন এবং দেখা করার পরও ছাত্রীটি এখনও উদ্ধার হয়নি। কালিয়াচক থানা প্রথমে ডাইরি নিতে অস্বীকার করে। পুলিশের অধিকারীরা ছেলেটির বাবাকে কোনও অজ্ঞাত কারণে চাপ সৃষ্টি করছে না। গত ১ জানুয়ারি আবার এস পি-কে মেয়েটিকে ফেরত পাওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। এইভাবে হিন্দু মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়ায় সুজাপুরের সংখ্যালঘু হিন্দুরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। সেই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, এতদিন ধরে একটি নাবালিকা মেয়ে অপহরণ হলেও প্রশাসনের তরফে তাকে উদ্ধার করার তেমন হেলদোল নেই কেন?

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার,
যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

মরিচঝাঁপি গণহত্যার ঘোষিত তদন্তাদেশের বিলম্ব মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্যতায় আঘাত হানছে

অসিত বরণ ঠাকুর

২৬ নভেম্বর ২০১২ তারিখের এক খবরে প্রকাশ মরিচঝাঁপির গণহত্যার সরকারি নথি না পাওয়ায় মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মতো মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন আটকে আছে। স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য-সংস্কৃতি দপ্তর উভয়েই মরিচঝাঁপিসংক্রান্ত তথ্য প্রদানে অপারগ বলে স্বরাষ্ট্র সচিব বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণে ১৯৭৯ সালের মরিচঝাঁপি গণহত্যার বিষয়ে প্রকাশিত খবরে কাগজের কাটিং চেয়ে পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্র দপ্তর। খবরে প্রকাশিত সংবাদ প্রামাণ্য নথি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা সে ব্যাপারে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালের মে মাসে ক্ষমতায় বসেই বিধানসভার প্রথম অধিবেশনে ১৭ জুনে ঘোষণা করেন যে ‘মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু গণহত্যার বিচারবিভাগীয় তদন্ত হবে। বিধানসভায় দেওয়া প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী মানতে বাধ্য। স্বভাবত পরিবর্তনপন্থীরা, উদ্বাস্তু গণসংগঠন, মানবাধিকার কর্মীরা ও আমজনতা এবং বিশেষ করে মরিচঝাঁপি গণহত্যায় সর্বস্বান্ত হয়ে পথেঘাটে পড়ে থাকা অসহায় উদ্বাস্তুরা ন্যায়বিচারের আশায় আনন্দিত হয়ে নতুন জীবনের আশায় বিভোর হয়ে উঠেছিল। দিনের পর দিন তাঁরা তদন্তের আদেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছে। এমনকি উদ্বাস্তু মন্ত্রী ও উত্তর ২৪ পরগণার জেলা শাসকের নির্দেশে কদম্বগাছির ‘উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতি (মরিচঝাঁপি)’ প্রচুর শ্রম, সময় ও অর্থ ব্যয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মরিচঝাঁপি-উৎখাত উদ্বাস্তুদের নাম- ঠিকানার প্রামাণ্য তালিকা তৈরি করে জেলা শাসকের নিকট জমাও দিয়েছে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন পাওয়ার প্রতিশ্রুতির আশায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৮ মাস পরে সরকারি নথি না পাওয়ার অজুহাতে

(ফাইল চিত্র)

তদন্তের আদেশ আটকে যাওয়ার খবরে তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হওয়ার সামিল। ক্ষতিপূরণ বা পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতিরও কোনও খবর নেই।

ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতি মতো ‘সাঁইবাড়ি হত্যা’ তদন্ত থেকে শেষের দিকে গঠিত ‘আনন্দমার্গী গণহত্যার’ তদন্ত পর্যন্ত অনেকগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছে। জায়গার অভাবে প্রথমে কাজ শুরুতে দেরি হলেও ‘ইন্দিরা ভবন’ পাওয়ায় সব কমিশনের কাজ ভালভাবে এগোচ্ছে। পরিবর্তনের সরকার গঠিত হওয়ার প্রারম্ভেই মরিচঝাঁপি তদন্ত কমিশন গঠন করার ঘোষণা হয়েছিল। ১৮ মাস পরেও সেই কমিশন গঠন না হওয়ায় সরকারের আন্তরিকতা নিয়ে এমনিতেই সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। এতদিন পরে সরকারি নথি না পাওয়ার অজুহাত তৈরিতে সেই সন্দেহ দৃঢ় হয়েছে। সন্দেহ নিরসনে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

১৯৭৮-৭৯ সালের মরিচঝাঁপির মর্মান্তিক ও পৈশাচিক ঘটনার সরকারি নথি না পাওয়ার কথা যা এখন বলা হচ্ছে তা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। সুদীর্ঘ ৯ মাসকাল ধরে ঘটা মরিচঝাঁপির ঘটনা (২০ আগস্ট ১৯৭৮ থেকে ১৬ মে ১৯৭৯) সরকারি দপ্তরে বিশেষ করে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পুলিশ ও প্রশাসনে এবং রাইটার্সে পাওয়া যাচ্ছে না সেটা কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রচুর চিঠিপত্র, সরকারি নির্দেশিকা, তথ্য, বেতার বার্তা, হাইকোর্টের নথি, কেন্দ্রের সঙ্গে পত্রালাপ, সরকারি ও সংসদীয় কমিটির প্রতিবেদন, মরিচঝাঁপি গণহত্যা সম্পর্কিত সংসদীয় আলোচনার নথি ও কেন্দ্রীয় নির্দেশনামার সবকিছু গায়েব হওয়া সম্ভব নয়। তৎকালীন সময়ের সাংবাদিক ছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী বহু নামিদামী সাহিত্যিক, শিল্পী, মানবাধিকার কর্মী, আমলা, রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিবেদনে ও লেখায় অত্যাচারের, বর্বরতার, বীভৎসতার ও গণহত্যার মর্মস্পর্শী কাহিনীর বিবরণ তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও পরবর্তীতে প্রকাশিত গবেষণামূলক পুস্তক/পুস্তিকায় ও তথ্যচিত্রের সিডিতে যেভাবে লিপিবদ্ধ আছে সেসবকে প্রামাণ্য তথ্য ও আইনগ্রাহ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ না করার কোনও কারণ আছে বলে মনে করি না। ক্ষতিগ্রস্ত উদ্বাস্তুদের নিজস্ব লেখা ও জবানবন্দীতে বর্বরতার যে করুণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ও বইতে লিপিবদ্ধ আছে তা অকাট্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে বাধ্য। তাছাড়া বেঁচে আছে বহু প্রত্যক্ষদর্শী, নির্যাতিত,

পঙ্গু ও সর্বস্ব হারানো ভুক্তভোগীরা, অত্যাচার ও গণহত্যায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তৎকালীন শাসক ও তাদের জল্লাদ বাহিনী, পুলিশ, আমলা, সমর্থনকারী ও বিরোধী রাজনীতিবিদরা। মরিচঝাঁপি ও তার পারিপার্শ্বিক জল-জঙ্গল ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী মানুষ আজও সাক্ষী হয়ে বেঁচে আছে। সেখানে গিয়ে তদন্ত করলে হয়তো আজও নোনামাটির পাঁকে কোনও হতভাগ্যের কুমিরে খাওয়া হাড়ের টুকরো মিলবে বা মাটিতে কান পাতলে সন্তানহারা মায়ের করুণ আর্তনাদ শোনা যাবে। ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে বহু লোক মারা যাওয়ায় স্থানীয় মানুষের বিক্ষোভ শুরু হয়। সেই সূত্রে তৎকালীন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মরিচঝাঁপি এলাকায় যান। অবিভক্ত ২৪ পরগণা জেলার পঞ্চায়েত আধিকারিক হিসাবে তাঁর সঙ্গীসাথী হওয়ায় আমারও মর্মান্তিক ঘটনার কিছু চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। সুতরাং তথ্য না পাওয়ার আশঙ্কা অমূলক ও ভিত্তিহীন। নিজস্ব তদন্তকারী পুলিশসহ একাধিক সদস্য-বিশিষ্ট বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন হলেই সত্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব হবে।

জ্যোতি বসুর সরকার ১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হয়েই দণ্ডকারণ্যে নির্বাসিত কৃষিজীবী বাঙালি উদ্বাস্তুদের বাঙালি-দরদে পুনর্বাসনের জন্য ডেকে এনেছিল সুন্দরবন অঞ্চলে তাঁদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে। দণ্ডক ফেরত লক্ষাধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবাংলায় ঢুকলেও শেষ পর্যন্ত হাজার ৩৫ উদ্বাস্তু পরিবার সরকারি সাহায্য ছাড়াই নিজ চেষ্টায় অসংরক্ষিত মরিচঝাঁপি দ্বীপে 'নেতাজিনগর কলোনি' পত্তন করে বিনা বাধায় এবং স্থানীয় মানুষদের স্বার্থহানি না করে এব স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রাণ চঞ্চল জনপদ গড়ে তুলে এক বৎসরকাল থাকতে পেরেছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ও স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব সর্বহারার বাম তকমার মুখোশ খুলে ফেলে ১৪৪ ধারার ঘেরাটোপে, লঞ্চের অবরোধে খাদ্যপানীয় বন্ধ করে ও হাইকোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে, পুলিশ ও দলীয় ক্যাডার দিয়ে উদ্বাস্তুনিধন যজ্ঞ চালিয়ে অগ্নি সংযোগে সমস্ত উদ্বাস্তু উৎখাত সমাপ্ত করা হয় ১৬ মে ১৯৭৯। সরকারি হিসাবে ২ জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করলেও মৃতের বা নিখোঁজের সংখ্যা কয়েক হাজার। ৩৫ বৎসর পর সঠিক হিসাব অসম্ভব হলেও এক গবেষক বলেছেন ১৭ হাজার উদ্বাস্তু আর দণ্ডকে ফেরেনি। তবে উদ্বাস্তুদের সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাইচরণ বারুই তিন-সদস্য বিশিষ্ট সংসদীয় তদন্ত কমিটিকে দেওয়া ২২ মার্চ ১৯৭৮ তারিখের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপিতে মৃত ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণের যে তথ্য দিয়েছিলেন তা গড়িয়ার জগদীশ মণ্ডলের লেখা 'মরিচঝাঁপি-নৈঃশব্দের অন্তরালে (গণহত্যার এক কালো ইতিহাস)' বইতে লিপিবদ্ধ আছে। শিবনাথ চৌধুরীর 'মরিচঝাঁপির কান্না', তুষার ভট্টাচার্যের 'অপ্রকাশিত মরিচঝাঁপি' ও মধুময় পালের 'মরিচঝাঁপি-ছিন্নদেশ, ছিন্ন ইতিহাস' বইতেও বহু প্রামাণ্য তথ্য আছে। গবেষণামূলক বিদেশি বইও আছে। মরিচঝাঁপি গণহত্যা স্বাধীনোত্তর ভারতের এবং বাংলার প্রথম গণহত্যা। এটা সংগঠিত হয়েছে বঞ্চিত-শোষিত-দলিতের তকমাধারী পার্টির হুকুমে ও নেতৃত্বে। তাই এর সুবিচার করে সর্বহারার পার্টির মুখোশ প্রকাশ করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দেওয়া দরকার। মরিচঝাঁপিসহ বাম আমলের সমস্ত অত্যাচারের, অপকর্মের, হত্যা-গণহত্যা ও দুর্নীতির তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেছেন। পিছিয়ে গেলে বা অপারগ হলে ইতিহাস তাঁকে কোনওদিন ক্ষমা করবে না। অন্তর্ধান রহস্যে ঘেরা নেতাজী আজও যেভাবে বাঙালিদের তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ঠিক সেইভাবেই মরিচঝাঁপির 'নেতাজিনগর স্রষ্টাদের' অন্যায় যুদ্ধে খতমের ইতিহাসও বাঙালিদের দুঃস্বপ্ন দেখাবে।

বাম আমলের সুবিধাভোগী, অপকর্মের ও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত বহু পরিবর্তনকামীর তকমাধারী আমলা, বিদ্বজ্জন, শিল্পী, রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিরা মা-মাটি-মানুষের সরকারের ও দলের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় স্থান করে নিয়েছেন। মরিচঝাঁপির বর্বরতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বেশ কয়েকজন দলে ও সরকারের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে আছেন। সঠিক তদন্ত হলে তাদের বা তাদের নিকটজনেরা ধরা পড়ার ভয়ে স্বাভাবিকভাবে তদন্তে বাধা বা প্রভাব বিস্তার করছেন। তবে তাদের জেনে রাখা ভাল যে তাদের সবাইকে মানুষ চেনে এবং নজর রাখছে। আর যারা সব হারানো উদ্বাস্তুদের আবেগ অসহায়তাকে ব্যবহার করে ও মড়াকান্নার কুম্ভীরাশ্রুতে অভ্যর্থনার নাটক করে ভোটে জিতে মন্ত্রি-সান্ত্রি বা ক্ষমতাবান হওয়ার পরে, প্রতিশ্রুতি পালন তো দূরে থাক, আজ আর তাঁদের চিনতেও চাইছেন না, তাদেরও মানুষ চিনে নিয়েছে। মরিচঝাঁপির গণহত্যার মূল নায়ক জ্যোতি বসুর মৃত্যুতে গোলাপ পাঠানোর দায় আর নেই। তাই তদন্তের আদেশে কোনও বাধা থাকার কথা নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে সিপিএমের সাহায্য চাওয়ায় মরিচঝাঁপির তদন্তের আদেশ নিশ্চয়ই আটকে থাকবে না।

২০১০ সালের ২৮ ডিসেম্বরের মতুয়া মহাসংঘের নেতৃত্বে কলকাতায় আয়োজিত মহাসম্মেলনে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব দেওয়ার যে সর্বদলীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল সে সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বা কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী আজ পর্যন্ত কোনও উচ্চবাচ্চ করছেন না। নাগরিকত্বের অভাবে তাঁরা বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। পরবর্তীর বহু আবেদন নিবেদনেও কোনও কাজ হচ্ছে না। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সক্রিয় ভূমিকার আবেদন জানাচ্ছি। ২ কোটির অধিক বাঙালির ভবিষ্যৎ জড়িত।

২০০৯ সালের লোকসভা ও পরবর্তীর ২০১১ সালের বিধানসভার নির্বাচনের আগে বহু লেখক, শিল্পী-কলাকুশলী, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষ মরিচঝাঁপি উৎখাত ও সাধারণ উদ্বাস্তুদের ন্যায়বিচারের দাবিতে বহু মিটিং-মিছিল, আবেগপূর্ণ বক্তৃতা ও লেখালেখি করেছেন। তাঁদের কাছে মরিচঝাঁপি গণহত্যার তদন্তে ও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানে বিলম্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ হওয়া দরকার। অভিজ্ঞতায় বলে প্রাক্-নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কদাচিৎ পালিত হয়। বহু সংখ্যক উদ্বাস্তু, উদ্বাস্তু ও মানবদরদী গণসংগঠন ও পরিবর্তনপন্থীরা উদ্বাস্তুদের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালনের কোনও উদ্যোগ আজও না নেওয়ায় আশাহত হয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তার প্রতিফলন ঘটতে পারে।

শিশুদের জন্যে বেঁচে থাকার গান

বিরাজ রায়॥ ‘ওর সঙ্গে খেলবে না, ওর এইচ আই ভি পজেটিভ।’ অভিভাবকরা যখন এই বলে নিজের ছেলেমেয়েকে সরিয়ে নেয়, তখন শিল্প, সাহিত্য সব কিছুই যেন সেখানে নীরস হয়ে পড়ে। সত্যিই, কতটা মর্মান্তিক হতে পারে এধরনের ঘটনা। অথচ সেই ছোট ছোট শিশুরা নিজেও জানে না কেন তার সঙ্গে খেলা যাবে না? কেন তার থেকে দূরে থাকতে হবে? একটা যে মারণ-রোগ তার ভিতর বাসা বেঁধে আছে সেটাও হয়তো সে জানে না। শুধু এইটুকুই জানে ও সবার থেকে আলাদা। আর দশটি শিশুর মতো সেও স্বাভাবিকভাবে হেসে-খেলে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারতো। জন্মের পর থেকে শুধু একটি ব্যাধিই তাকে আলাদা করে রেখেছে গোটা সমাজ থেকে। আর আমরাও জেগে ঘুমোনোর ভান করে সরিয়ে রেখেছি নিজেদেরকেও। একবারও ভাবছি না, সত্যিই কি ওদের সঙ্গে মিশলে আমার সন্তানটিও এইচ আই ভি-তে আক্রান্ত হবে? ওদের শারীরিক অসুখ নয়, আমাদের এই না ভাবার কারণটাই যেন একটি সামাজিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সমাজ নিষ্ঠুর হলেও তাদের থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিতে পারেননি সাতচল্লিশ বছর বয়সি ডাঃ কল্লোল ঘোষ। এইচ আই ভি আক্রান্ত শিশুদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দিতে তিনি তৈরি করেছেন একটি অনাথ আশ্রম, ‘আনন্দঘর’। বারুইপুরের এই আশ্রম পিতৃমাতৃহীন বাষট্টিটি শিশুর একমাত্র অবলম্বন। এরকম একটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে কল্লোল ঘোষ নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

অন্য রকম

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের মধ্যে এই রোগ সংক্রমিত হয়েছে তাদের বাবা-মায়ের থেকে। চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েও খুব একটা লাভ হয়নি। অধিকাংশ হাসপাতালে এইচ আই ভি আক্রান্তদের এ আর ভি থেরাপির কোনও ব্যবস্থা নেই। সেই অর্থে নেই চিকিৎসা পরিকাঠামোও। আর যা আছে সেটাও পর্যাপ্ত নয়। আর সবথেকে বড়ো কথা হলো মানসিক স্থিতি। এই রোগ থেকে মুক্তির আশ্বাস না থাকলেও প্রতিরোধের জন্য বা যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের সুস্থ রাখার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ। যেটা সব সময়ই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাবে। তারাও যে সবার মতো স্বাভাবিক এই বোধটা ওদের মধ্যে সবসময় কাজ জাগানো দরকার। সচেতনতার এই অভাবটাই আমাদের প্রতিটি স্তরে রয়েছে, যেটা তাদের একঘরে করে রেখেছে আমাদের সমাজ থেকে। এই পরিবেশ থেকে সমস্যাক্লিষ্ট ওই শিশুদের বার করে আনতে চাই কল্লোলবাবুর মতো আরও অনেক হাত। যারা এগিয়ে আসবে ওদের মধ্যে বাঁচার আশ্বাস জাগাতে। সবার অলক্ষ্যে অবহেলায় যে জীবনগুলি হয়তো অকালে ঝরে যেত, হারিয়ে ফেলতো জীবনের গতি, আজ তাদেরই কলরবে মুখর ‘আনন্দঘর’। সেখান থেকে তারা প্রতিদিন স্কুলে যাচ্ছে, খেলছে। প্রতি সপ্তাহে ডাক্তার এসে পরীক্ষা করছে তাদের স্বাস্থ্য। বাইরের জগতকে দেখানোর জন্য তার অনুভূতি লাভের জন্য মাঝেমধ্যেই আয়োজন করা হচ্ছে ভ্রমণের। গত আগস্ট মাসেই তারা ঘুরে এসেছে দীঘার কাছে সমুদ্রতীরবর্তী শঙ্করপুর থেকে। এভাবেই একটি মানুষ কতগুলি ভবিষ্যৎকে শুনিয়ে যাচ্ছে বেঁচে থাকার গান।

এই কাজের জন্য ইতিমধ্যেই আনন্দঘরকে একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি জানিয়েছেন— ‘আমার এটা কোনও বিশেষ পাওনা নয়। এই অনাথ শিশুদের হাসি-খুশি একটি জীবন দিতে পারলেই আমার কাজকে সার্থক মনে করব।’

নাটক শুরু হয়ে গেছে সবাই মোবাইল বন্ধ করুন

সুধী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

কোনও কথা বলবেন না প্লিজ। কেউ টুঁ শব্দটি করবেন না। নাটক শুরু হয়ে গেছে। আপনাদের নিজের নিজের এবং পাশের জনের মোবাইল ফোন বন্ধ করে দিন। নাটক চলাকালীন মোবাইল ফোন বেজে উঠলে অভিনেতা অভিনেত্রীদের মনোসংযোগে অসুবিধা হয়। আশা করি আপনারা সহযোগিতা করবেন। শুরু হচ্ছে আমাদের পালা, 'লাগ ভেলকি লাগ'।

আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে ভাবতে বসেছেন এবার যা শীত পড়েছে তাতে সারাদিন হনুমান টুপি পরে থেকে সুনন্দ মৌলিকের মাথা নিশ্চিত বিগড়েছে। কিন্তু না। মোটেই মাথার কিছু হয়নি। তবে হলেও হতে পারে। আসলে একটি নাটকের খসড়া আমার হাতে এসেছে। সেটি আপনাদের হাতে না পাঠানো পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখা যাচ্ছে না। আপনাদের মাথার গোলমাল দেখা দিলে আপনারা সামলাবেন। আমার কোনও দায় নেই। তবে যাদের মাথা নেই তাদের বাঁচোয়া। আসলে মাথা গোলমালের ভয় নেই।

পালা

লাগ ভেলকি লাগ

নাটক, নির্দেশনা ও মুখ্য ভূমিকায় (হাজি) আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা

অপর মুখ্য চরিত্রে আরাবুল ইসলাম সহ লেফট-রাইট নেতৃবৃন্দ

প্রথম অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

কাঁধে গামছা নেতা গাড়ি করে যাচ্ছেন। পাশ দিয়ে একটার পর একটা ভেড়ি পিছন দিকে ছুটছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড় এলাকার রাস্তা। মাঝে মাঝে গাড়ি আস্তে হলে পথচারিরা বলছেন, আস্‌সালা-মু আলায়কুম হাজি সাহেব। প্রত্যুত্তরে রেজ্জাক সাহেব বলছেন, আলাইকুমুস্‌সালাম।

—কনে যাচ্ছেন কমরেড? —এই একটু কাঁটাতলায়। —সেকি পুলিশ ফোর্স নেননি? ওখানে তৃণমূলীরা মিটিন করছে! —পুলিশকে কয়েছিলাম। কিন্তু পারমিশন দেয়নি। আমি কি ওদের ডরাই নাকি? হতি পারি ক্যানিংয়ের এমএলএ, কিন্তু এই ভাঙড়ের ভেড়িতেও বাঘে গোরুতে এই চাষার ব্যাটার ভয়ে এক ঘাটে জল খায়। হাজি সাহেবের গাড়ি বেরিয়ে যায়। ধুলোয় ঢেকে যায় রাস্তা।

ফ্ল্যাসব্যাক : কাঁটাতলায় ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস অফিস। একটু দূরেই আগুনে পুড়ে যাওয়া সিপিএম অফিসের মাথায় উত্তুরে হাওয়াতেও নেতিয়ে আছে ঝাণ্ডা।

দ্বিতীয় দৃশ্য : রেজ্জাক সাহেব তৃণমূলের সভার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ বাধা দিচ্ছে। কিন্তু আটকানো যাচ্ছেই না। চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে শুধু দুটো শব্দ বোঝা যাচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। *চাষার ব্যাটা দেখে নেবে।*

এসবের মধ্যেই রেজ্জাক সাহেব মাটিতে। লাঠি, রড, লাথি, চড়। পিছনে আবহ সঙ্গীত অ্যাকশন সিনেমার অনুকরণে-ঢিসুম, ঢুসুম।

তৃতীয় দৃশ্য : হাতপাতালের বিছানায় শুয়ে আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা। নাকে নল, হাতে নল। নার্স, ডাক্তার, হুইল চেয়ার, ট্রলি। স্যালাইনের বোতল, এক্স রে মেশিন। একের পর এক নেতা আসছেন, কথা বলছেন বাইরে বেরিয়ে বাইট দিচ্ছেন, গাড়ি ধরে কাজে চলে যাচ্ছেন। গাড়ির ইঞ্জিন থেকে আওয়াজ উঠছে— 'আরাবুলকে গ্রেফতার করতে হবে...করতে হবে...করতে হবে...'

রাস্তার পাশে এক পাগল গান গেয়ে চলেছে, *জলের ছিটা দিতে গিয়া, খাইলেন চোরের গুঁতা/টিকিট কাইট্যা দেখরে সবাই, হাসপাতাইলে ন্যাতা। আহাঃ হাসপাতাইলে ন্যাতা।*

এমন সময় লালবাতির গাড়ি এসে দাঁড়ালো, নেমে এলেন ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ির এক গুরুভার নেতা। পরনে চোস্ত পাজামা আর হাওয়াই শার্ট। মঞ্চের পিছন থেকে কোরাস ধ্বনি : মহামহিম, মহাসচিব, মহানেতা, মহামন্ত্রী শ্রী শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় পধার রহে হ্যায়... হাতে ফুল নিয়ে মিডিয়ার ক্যামেরায় মৃদু স্মাইলি দিয়ে ঢুকলেন হাসপাতালে। বের হলেন। বাইট দিলেন। গাড়িতে চড়লেন। গাড়ির ইঞ্জিন আওয়াজ তুলল, আরাবুল ভালো

ছেলে...আরাবুল ভালো ছেলে...আরাবুল ভালো ছেলে... রাস্তার পাশের সেই পাগল ফের গান ধরল, *শাসন করা তারি সাজে, আদর করে যে যেডায় ভাঙল দাঁতের গোড়, সেই ফুল আনিসে।*

দ্বিতীয় অঙ্ক : প্রথম দৃশ্য :

স্থান সেই ভাঙড়। কাঁটাতলা থেকে একটু দূরে বামনঘাটা। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন আরাবুল ইসলাম। আশপাশে ক্রীড়াসঙ্গীরা। পাশ দিয়ে একের পর এক লোক বোঝাই লাল ঝাণ্ডা গাড়ি ছুটছে। সুর করে সবাই গান ধরেছে, *কদম কদম বাড়ায়ে যা/ আরাবুলকে ধরগে যা/আলিপুরে মিটিংয়ে যা।*

আচমকাই যেন বজ্র নিনাদ। ভালো ছেলে আরাবুল বোকার মতো দাঁড়িয়ে। লরি বোঝাই মানুষেরাও ভালো মানুষের মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। শীতের সকালেও এক অবর্ণনীয় উত্তাপ তৈরি হলো। হঠাৎ মনে হবে ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। শিলাবৃষ্টি হচ্ছে। দর্শকরা একটু কান পাতলে বুঝতে পারবেন না, এটা বৃষ্টির শব্দ নয়। এ তো গোলাগুলির শব্দ। বজ্রনিনাদ নয়, বোমানিনাদ। সেই শব্দ ব্রহ্ম হইতে এমন এক তেজ উৎপন্ন হলো যে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িগুলো দাউ দাউ করে জ্বলতে শুরু করল। বিভিন্ন রঙের রাজনৈতিক স্লোগান কোরাস ধ্বনিতে শোনা গেল, আমরা গুলি চালাইনি, আমরা বোমা ছুঁড়িনি।

হাত-পা কাঁপতে শুরু করল আরাবুলের। এমন শব্দ তো আগে কখনও সে শোনেনি। এমন আগুন দেখেনি। সে যে ভালো ছেলে। নিজে নিজেই এক হাতে বুক চেপে ধরে অন্য হাতে স্টিয়ারিং, গিয়ার, হর্ন সামলে হাসপাতালে চলে এল।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন রেজ্জাক মোল্লা। হঠাৎ মুখটা বদলে আরাবুল হয়ে গেল। নাকে নল, হাতে নল। নার্স, ডাক্তার, হুইল চেয়ার, ট্রলি। স্যালাইনের বোতল, এক্স রে মেশিন। একের পর এক নেতা আসছেন, কথা বলছেন বাইরে বেরিয়ে বাইট দিচ্ছেন, গাড়ি ধরে কাজে চলে যাচ্ছেন। গাড়ির ইঞ্জিন থেকে আওয়াজ উঠছে— ‘রেজ্জাককে গ্রেফতার করতে হবে...করতে হবে...করতে হবে...’

শেষ অঙ্ক : শেষ দৃশ্য :

মঞ্চের দুপাশে দুটি স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। ফ্ল্যাগ, ফেস্টুন, কাটআউট আসছে। শুধু মঞ্চের মাঝখানে অঝোরে বৃষ্টি। সেই পাগলাটা ভিজতে ভিজতে গান গেয়ে চলেছে।

লাগ ভেলকি লাগ/তেরেকেটে তাক তাক/লাগ ভেলকি লাগ/ নটুয়ারা বেঁচে থাক। ভোজবাজি, ড্রামাবাজি, টিকে থাক, টিকে থাক/ লাগ ভেলকি লাগ, লাগ ভেলকি লাগ।।

নাটকটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। শুনছি আগামী পঞ্চায়েত ভোটের আগে পাত্র মিত্র বদলে দিকে দিকে এটি মঞ্চস্থ হবে। মিস করবেন না। তবে মোবাইল ফোন এবং মস্তিষ্কের সুইচটা অফ রাখলেই ভালো।

— ***সুন্দর মৌলিক***

“এ সনাতন ধর্মের দেশ। এ দেশ পড়েছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই আবার উঠবে। এমন উঠবে যে জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে।” — স্বামী বিবেকানন্দ

S. Goenka

A Well Wisher

তোমার সুরে গাহি আজও গান

তুষারকান্তি ঘোষ

কিশোর জীবনের বৈশিষ্ট্য হলো বীরত্বের কাহিনীর প্রতি এক সহজাত আকর্ষণ। আর এই কাহিনীর নায়কেরা যদি সশরীরে সামনে হাজির হয়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয় জীবনের দ্বারে তখন মনের গ্রন্থিগুলো তাঁদের এক শ্রদ্ধাভাবনায় বেঁধে রাখার চেষ্টা করে আজন্মকাল।

সঙ্ঘের বীরত্বপূর্ণ কাজ করার জন্য যেসব স্বয়ংসেবকের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করার সুযোগ প্রাক্-কিশোর জীবনে উপলব্ধ করেছিলাম তাঁদেরই একজন জয়দেবদা। অহীন্দ্রকুমার দে। যিনি গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১২-তে অমর্ত্যলোকে যাত্রা করেছেন।

জয়দেবদার সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৬ সালে। আমি তখন মালদার কালীতলা শাখায় আসতাম। কালীতলা শাখার মুখ্য শিক্ষক ছিলেন সৌরেনদা (সৌরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী)। শাখা শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমরা ধ্বজের কাছের গোল জায়গায় বসে পড়ে গল্প শুনতাম। আমরা যেন ব্রতকথার শ্রোতা আর সৌরেনদা কথকঠাকুর। মাত্র দশ বছর আগে মালদহ জেলার উপর দিয়ে যে রাজনৈতিক দুর্যোগ বয়ে গিয়েছিল সেইসব কাহিনী।

একদিন দেখি জয়দেবদা শাখায় চলে এলেন। তিনি তখন নগর কার্যবাহ। সপ্তাহে বিভিন্ন শাখায় তাঁকে যেতে হোত। শাখা বলতে তখন শহরে যেসব সায়ম শাখা ছিল তার মধ্যে কালীতলা শাখার নাম ছিল বিবেকানন্দ শাখা। এই শাখা হোত বর্তমান ক্ষুদিরাম পার্কে।

জয়দেবদা স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে খুব সহজেই মিশতে পারতেন। তিনি সমবেত সঙ্গীত শেখাতেন। যখন পরে শুনতাম এই গানগুলো তাঁরই লেখা তাঁরই সুর দেওয়া। আমাদের শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যেত। কারণ আমরা তখন রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল, রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছাড়া গান কেউ রচনা ও সুর

দিতে পারেন তা ভাবতে পারতাম না।

একবার কালীতলায় মিলিত শাখা হচ্ছে সঙ্ঘের উৎসব উপলক্ষে। আমরা সব বসে আছি। বংশীদা জয়দেবদার নতুন গান শেখাচ্ছেন "ভারত আমার জননী আমার। নমি বারবার পদে তোমার।" জয়দেবদাও বলেছিলেন। নমি বারবার বলার পর 'পদে' স্থানে এসে সব হোঁচট খেতে লাগল। বংশীদা অনেকবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। জয়দেবদা হাল ধরলেন। সংশোধন করে দিলেন তাঁর নিজের লেখা গান— 'নমি বার বার চরণে তোমার।' উৎসব সমবেত গানের ঝংকারে মুখরিত হয়ে গেল। জয়দেবদার গলার স্বর মধুর ছিল। স্বয়ংসেবকদের সামনে কথা বলার সময়ও দেখেছি তাঁর সেই সুর ধ্বনি অন্তর হতে বের হয়ে আসতো। সঙ্গীতের সাধকেরা যে এত সাহসী হয় সেকথা পরে জেনেছিলাম।

একদিন শাখার শেষে মুরলীদার প্রসঙ্গ উঠল। জয়দেবদা মুরলীদার সম্পর্কে আমাদের কাছে এক অদ্ভুত ধারণা দিলেন। ১৯৪০ সালে বেনারস থেকে মুরলীদা পিতার রেশমের ব্যবসা দেখার জন্য মালদহে এসেছিলেন। তিনিই ১৯৪২-এ মালদহে শাখা আরম্ভ করলেন। পরে একজন প্রচারক আসেন তাঁর নাম মালকেজি। ভারত ভাগের সময় মালদহও ভাগ হয়ে যায়। অগস্টের দিনগুলোতে শহরকে কিভাবে মুরলীদাও গোঁসাইজী (শুভনারায়ণ গিরি) বাঁচিয়ে ছিলেন তারই সব কাহিনী। অবাক হয়ে শুনতাম সেসব কাহিনী।

এক শনিবার মুরলীদা এলেন। তাঁকে আমরা ঘিরে ধরলাম সেসব দিনের কাহিনী বলার জন্য। মুরলীদা নিজের কাহিনী বললেন না— কিন্তু জয়দেবদা প্রসঙ্গ তুলে বললেন, জয়দেব কেমন সাহসী ছিল সেকথা শোন। এই কথা বলেই তিনি অতীতে চলে গেলেন। বললেন "১৯৪৭-এর ১২ আগস্ট মালদহ পাকিস্তানের জিম্মায় চলে গেল। গোটা মালদহ জুড়ে হিন্দুদের মনে আতঙ্ক। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তখন চাঁপাই নবাবগঞ্জে। শিবগঞ্জ চাঁপাই নবাবগঞ্জ এইসব এলাকায় বিস্তারকের কাজ দেখছিলেন। তাঁকে চাঁপাই নবাবগঞ্জ থেকে মালদহ শহরে নিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল। চতুর্দিকে দাঙ্গা হচ্ছে। এই অবস্থায় চাঁপাই নবাবগঞ্জে পাঠালাম অজিত, জয়দেব, নারায়ণ আর ম্যান্টাকে। এরা ট্রেন ধরে মালদহ কোর্ট স্টেশন থেকে আমনুরা অবধি গেল। তারপর ট্রেন চলাচল বন্ধ। আমনুরা থেকে ওরা হেঁটে গেল চাঁপাই নবাবগঞ্জ। চতুর্দিকে তখন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গা। জয়দেবের বয়স তখন ১৭/১৮ হবে। আমার আদেশ অমান্য করেনি। বাড়িতে কাউকে খবরও দেয়নি যদি তাকে না যেতে দেয়। দুদিন বাড়ির লোকেরা উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছিল। ওরা সব ফিরে এল সুকুমার ব্যানার্জিকে নিয়ে। তোদের ওইরকম সময় পাঠালে তোরা কি যেতিস?' এই হচ্ছে জয়দেব। মুরলীদা ছিলেন জয়দেবদার কাছে এক বিশাল হিরো। আর আমাদের কাছে জয়দেবদা।

হঠাৎ শুনলাম জয়দেবদা প্রচারক হয়ে চলে যাচ্ছেন মালদা ছেড়ে। ১৯৫৭ সালে উল্টোরথের দিন মিলিত শাখা হলো গোঁসাইজীর বাড়িতে। কেমন এক বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশ। কিন্তু পরিবেশ ঘুরিয়ে দিলেন জয়দেবদাই। সেই হাসিখুশী ভাব। তিনি ভাষণে বললেন, 'মালদার রামকেলি আর নদীয়া নবদ্বীপকে বাঁধতে চললাম আমি।" বংশীদা

উত্তেজক ভাষণ দিলেন। বিষণ্ণতা কেটে গেল।

১৯৬২-তে জয়দেবদা ফিরে এলেন মালদহে। ১৯৬২ থেকে আটষট্টির মধ্যে জয়দেবদা নিজের জীবনকে তৈরি করে নিলেন। জয়দেবদা আই এস-সি পাশ করে প্রচারক জীবনে যোগ দেন। ফিরে এসে বি এ পাশ করলেন। বাংলায় স্পেশাল অনার্স করলেন। কোবিদ হলেন। আমি আর জয়দেবদা একসঙ্গে কোবিদ ক্লাস করতে যেতাম। হিন্দী লিখনে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। পরে ১৯৭০-এ বাংলা সাহিত্যে এম এ পাশ করলেন। জয়দেবদার এই সারস্বত সাধনা ছিল নীরবে। তিনি জানতেন বিদ্যার বৈভব না থাকলে সমাজ সহজে স্থান দেবে না।

এরই মাঝে চলতে লাগল তাঁর সাহিত্য সাধনা। তাঁর জীবনে সাহিত্যধর্মিতা এক বিশেষ গুণ ছিল। ‘স্বস্তিকা’ ‘অর্গানাইজার’ এমনকি ‘পাঞ্চজন্য’ (হিন্দী)-তে প্রবন্ধ লিখেছেন। জয়দেবদা সহজ কথাকে সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে পারতেন। সহজ ভাষা তাঁর অধীত গুণের বৈশিষ্ট্য ছিল।

জয়দেবদা প্রায়ই বলতেন ‘‘মণি, আদর্শবাদের সংকটের যুগ আসছে। স্বয়ংসেবকদের এর সম্মুখীন হতেই হবে। স্বয়ংসেবকেরা আজকাল যেন অধ্যয়ন বিমুখ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের আদর্শের যে বিশালত্ব তা যেন তারা অনুভব করতে পারছে না।’’ জয়দেবদা তাই লিখলেন ‘রাষ্ট্রীয়তার প্রেক্ষাপটে’, ‘চিরায়ত হিন্দুধর্ম’। এক গভীর অনুশীলন থেকে উঠে এল এই গ্রন্থগুলো।

জয়দেবদা ললিতমোহন শ্যামমোহিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৬৪-এ শিক্ষকতা শুরু করেন। বংশীদার নির্দেশে চলে গেলেন ১৯৬৭ সালে প্রমথপ্রসন্ন সেনগুপ্তের সঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ সাহা বিদ্যাভবন প্রতিষ্ঠা করতে। এই বিদ্যালয় থেকেই ১৯৯৬-এ অবসর গ্রহণ করেন। ছাত্রদের মধ্যে ভারতের অমর বীরদের কাহিনী ছড়িয়ে দিতে লিখলেন ‘দুর্বার দুর্জয়’, ও ২য় খণ্ড’। বইদুটি বহু স্কুলে পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই গ্রন্থটির একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন--- মাস্টারমশায়, কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী।

সমাজ জীবনে বহু দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। ‘উত্তরবঙ্গ’ বন্যার্ত সেবা সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল কমিটি মালদহ জেলার ছিলেন সহ-সম্পাদক। শিবাজী রাজ্যারোহণ ত্রিশতাব্দী স্মারক সমিতির সম্পাদক। মালদহে সংস্কার ভারতীর কাজ তিনিই শুরু করেছিলেন। অসংখ্য গীতি আলেখ্য রচনা করে মালদহের প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের একসঙ্গে অনুষ্ঠান করেছেন। বন্যায় ত্রাণকার্য চালিয়ে ছিলেন বহু গ্রামে। জীবনে ক্লান্তি তিনি অনুভব করেননি।

মালদহ জেলা কার্যবাহ হতে মালদহ বিভাগ সংঘচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৭১ এর যুদ্ধে মানুষের মনে সাহস জাগানোর অজস্র কার্যসূচী গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় তিনি চালিয়ে ছিলেন সৈনিক অভ্যর্থনা কেন্দ্র। ১৯৭৬-এ জরুরী অবস্থার বিরুদ্ধে কারাবরণ করেছিলেন। জয়দেবদার বাড়ি ছিল সমাজের জন্য অর্পিত। পিতা সূর্যকান্ত দে ছিলেন হিন্দু মহাসভার নেতা। প্রাক্ স্বাধীনপর্বে বহু নেতা তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। জয়দেবদার বাড়িতে এসেছেন পূজনীয় গুরুজী, বালাসাহেবজী, আপ্তেজী, পিংলেজী, একনাথজী, দীনদয়ালজী--- এছাড়াও অসংখ্য কার্যকর্তা। জয়দেবদার অতিথি বাৎসল্য প্রবাদপ্রতিম ছিল। ১৯৫৮-এ গুরুজী নকুলদার বাড়িতে উঠলেন। জয়দেবদা তখন নবদ্বীপে। গুরুজী বললেন, ‘‘আমি একবার জয়দেবের বাড়ী যাব। গুরুজী বাড়ির সবার সঙ্গে এসে দেখা করে গেলেন।’’

জয়দেবদার জন্য সংস্কার ভারতী ১৯৯২ সালে সংবর্ধনা জ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে আমি সভাপতি ছিলাম। প্রখ্যাত প্রবীণ সঙ্গীত শিল্পী রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জয়দেবদাকে উত্তরীয় পরিয়ে দিয়েছিলেন। জয়দেবদার জীবনের বহু কাহিনী সেদিন সভায় উপস্থাপিত করেছিলাম। সভা শেষে আমাকে ধমকে ছিলেন— ‘‘মণি, আমার উপস্থিতিতে আমার জীবন কাহিনী তোকে বলতে বলেছিল? তোর বক্তৃতা চলাকালীন আমার খুব অস্বস্তি লাগছিল।’’

আজ তাঁর দেহান্তের পর এই স্মৃতিচারণায় যে ভাষায় লিখি না কেন তিনি আর অস্বস্তি প্রকাশ করবেন না। আমি তাঁর স্নেহের সাগরে চিরদিন সিক্ত হয়েছে। অসুস্থ শরীরে মাঝে মাঝে বাজার করতে আসতেন। এলেই বাড়িতে আসতেন। মার সঙ্গে কত কথা হোত। মা জয়দেবদাকে খুবই স্নেহ করতেন। মা-র মৃত্যুর পর মায়ের লেখা কবিতার বই যেদিন উন্মোচন অনুষ্ঠান করেছিলাম, জয়দেবদার শরীর সেদিন ভাল ছিল না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা উপেক্ষা করে তিনি এলেন। বললেন, ‘‘দ্যাখ, মাসিমার এই অনুষ্ঠানে না এলে আমার যা মানসিক যন্ত্রণা হোত তা দেহের যন্ত্রণার শতগুণ ছিল।’’

জয়দেবদা মানুষের হৃদয়ের সম্পর্ককে ঈশ্বরীয় আদেশ বলে মনে করতেন। এই নিরহংকারী সর্বজনপ্রিয় মানুষটির সঙ্গে সবার সম্পর্ক ছিল। সঙ্ঘের কার্যপ্রবাহে মালদহের সমাজ মণ্ডলে জয়দেবদা ছিলেন লম্বা রেসের ঘোড়া। বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে তাঁকে চলতে হয়েছিল। জীবনের দেবতাকে তিনি যুদ্ধের নায়ক বলে ভাবতেন। তাই তিনি হারতে শেখেননি। ধর্মকে ছাতার মতো দুঃসময়ের বৃষ্টিতে মাথায় ধরতে শেখেন। ধর্মকে তিনি মানুষের আত্মার মুক্তির পথ বলে জানতেন। অষ্টাদশ পুরাণ তাঁর অধীত বিদ্যায় ছিল। ছিল রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদ।

আমি তাঁর শেষ জীবনে প্রায়ই তার কাছে গিয়েছি। আমি না গেলে তিনি কষ্ট পেতেন। একদিন ফোন করে দ্রুত ডাকলেন— নীচের ঘরের একটি তুলসীতলা স্টুডিও করার জন্য তাঁর ছোটপুত্র মান্নাকে না ভাঙ্গার পরামর্শ দিতে বললেন। আমি মান্নাকে বললাম এই উঠোনটাই জয়দেবদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে— হয়তো নতুন কনস্ট্রাকসনে তোকে কিছু বলবেন না— কিন্তু বেদনা পাবেন। মান্না ছেড়ে দিল নতুন নির্মাণ।

জয়দেবদার শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায়। কত গান তিনি লিখেছেন। সুর দিয়েছেন।। অসংখ্য দেশভক্তের কণ্ঠে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে— হতে থাকবে চিরদিন।

মান্নার আহ্বানে ২১ ডিসেম্বর রাত্রে জয়দেবদাকে দেখতে গেলাম। বুঝলাম তাঁর যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। চিকিৎসক পরামর্শ দিয়ে চলে গেলেন। কর্মযোগী মানুষটি স্থির অবিচল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন— ভাষাহীন। তাই নীরব তাঁর কন্ঠের শেষ বাণী শুনতে পেলাম— ‘‘I took my pen for sword, I now know we are powerless. No matter.’’ সেদিনের অসীম সাহসী যোদ্ধা আজ ক্লান্ত।

সমাবেশ সমাচার

বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৮তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন সম্পন্ন

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৮তম রাষ্ট্রীয় অধিবেশন সম্পন্ন হলো পাটনায়। গত ২৬-২৮ ডিসেম্বর ২০১২ কুপ. সী সুদর্শন নগরের বালাসাহেব আপ্টে সভাগারে অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশন। ভারতবর্ষের ২৮টি রাজ্য তথা আন্দামান-নিকোবর, লেহ-লাদাখ-এর মতো দুর্গম জায়গা সহ প্রায় ৩২০০ প্রতিনিধি এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও নেপাল থেকে নেপাল প্রাজ্ঞিক বিদ্যার্থী পরিষদের ৫৫ জন, অন্ত রাজ্য ছাত্র জীবন দর্শন (SEIL)-র ৫৭ জন এবং Wosy-র ২ জন প্রতিনিধির উপস্থিতি এই অধিবেশনের শোভা বর্ধন করে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই অধিবেশনের শুভারম্ভ করেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশ সচিব জে. সি. শর্মা। স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র, বিদ্যার্থী পরিষদের দেশব্যাপী বিবিধ কার্যক্রমের চিত্র সম্বলিত প্রদর্শনী এই অধিবেশনকে অন্য মাত্রা দান করে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সরকার্যবাহ মাননীয় সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশী, সহ-সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী ও দত্তাত্রের হোসবালে এই অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ ২০১২-১০১৩ সালের কার্যকরী কমিটি ঘোষণা হয়। সর্বভারতীয় সভাপতি রূপে হায়দরাবাদের অধ্যাপক পি. মুরলী মনোহর এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দিল্লীর উমেশ দত্তশর্মা নির্বাচিত হন।

পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের ৩০তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই অধিবেশন স্থলে। অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন ও সুবীর হালদার ২০১২-২০১৩ সালের রাজ্য কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক রূপে পুনঃনির্বাচিত হন।

কলকাতায় সংস্কার-ভারতীর শিল্পী সম্মেলন

সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ২২তম শিল্পী সম্মেলনের প্রথম পর্বটি উদ্‌যাপন হলো গত ২৫ ডিসেম্বর, মানিকতলার কল্যাণ ভবনে। এক দিবসের এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন কলকাতা মহানগর, হাওড়া নগর এবং ২৪ পরগণার বিভিন্ন শাখার ১২০ জন শিল্পী সদস্য। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে সম্মেলনের অনেকাংশ জুড়েই ছিলেন স্বামীজী। অধ্যাপিকা শ্রীমতী দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ মানবচরিত্র গঠনের পদ্ধতির ওপর একটি মনোজ্ঞ বক্তব্য রাখেন। স্বামীজির রচনা থেকে পাঠ করেন বিভিন্ন সদস্য। সান্ধ্য অনুষ্ঠানেও অন্যান্য নৃত্যগীত পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় নানাভাবে। সান্ধ্যকালীন প্রকাশ্য অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হয় রামমোহন লাইব্রেরি হলে। প্রান্তীয় সভাপতি ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব তপন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রান্তীয় সহ-সভাপতি ও সাহিত্যিক গুরু বিশ্বাস, ক্ষেত্রীয় সাধারণ সম্পাদক সুভাষ ভট্টাচার্য ও অখিল ভারতীয় নাট্যপ্রমুখ বিকাশ ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, সম্মেলনের দ্বিতীয় পর্বটি অনুষ্ঠিত হবে হাওড়ার তাঁতিবেড়িয়ায়। ২রা ও ৩রা ফেব্রুয়ারির এই পর্বে যোগ দেবেন হাওড়া, হুগলী, আসানসোল, মেদিনীপুর, বীরভূম ও নদীয়া জেলার সদস্যেরা।

শোকসংবাদ

চারুচন্দ্র দাস পরলোকগমন করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দিনাজপুর বিভাগ প্রচার প্রমুখ অপূর্ব দাসের বাবা। ২ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। বয়স ৮১ বৎসর। পাঁচ পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের তিনি রেখে গেছেন।

গত ৭ জানুয়ারি বিমলকৃষ্ণ চৌধুরী পরলোকগমন করেছেন। তিনি সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক দেবব্রত চৌধুরীর বাবা। তিনি তিন পুত্র, ১ মেয়ে ও স্ত্রীকে রেখে যান।

***

গত ৩ জানুয়ারি উষা রাণী ঝা পরলোকগমন করেছেন। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত (উত্তরবঙ্গের) নকুল চন্দ্র ঝা-এর মাতা। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র এবং ৬ কন্যা রেখে গেছেন।

থিয়েটার কমিউনের নাটক

‘জাগ্রত বিবেক’

রঙ্গম

বিকাশ ভট্টাচার্য

ইতিপূর্বে বাংলা নাট্যজগতে স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা কিছু হয়েছে বলে মনে পড়ে না। তাঁর জন্মশতবর্ষেও না। তবে সার্ধজন্মশতবর্ষে এই মুহূর্তে কলকাতাতেই তিনটে নাটক এখন চলছে। সম্প্রতি থিয়েটার কমিউন তাদের ‘জাগ্রত বিবেক’ নিয়মিত অভিনয় করছে। প্রবীণ নাট্যকার বিজয় ভট্টাচার্য এই নাটকের নাট্যকার। তাঁর নাটকে, সচরাচর যেমন দেখা যায়, স্বামীজীর শৈশব থেকে পরিণতি পর্যন্ত জীবন কাহিনী না দেখিয়ে একটু ব্যতিক্রমী ভঙ্গিতে নাটকটি আমাদের সামনে এনেছেন। এখানেই নাট্যকার বিজয় ভট্টাচার্যের মুন্সিয়ানা।

বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের সুবল বৈরাগ্য পেশায় বহুরূপী। বিভিন্ন মহাপুরুষের রূপ ধরে সে গ্রামেগঞ্জে ঘুরে বেড়িয়ে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে। এভাবেই সে একদিন গৈরিক বসন পরে স্বামী বিবেকানন্দ সেজেছিল। স্বামীজীর গৈরিক বসন অঙ্গে ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এলো। তার পার্থিব জীবনকে শূন্য মনে হতে লাগল। সে ছুটে গেল কলকাতায় আশ্রমের মহারাজের কাছে। তিনি তাকে স্বামীজীর জীবনের কথা বললেন। কিছু বই দিলেন আরও কিছু জানার জন্যে। সে সব পড়ে সুবল যেন এক অন্য মানুষে পরিণত হলো। কাজকর্ম শিকেয় উঠলো। বৌ ভয় পেয়ে সুবলের জ্যাঠাকে ডেকে নিয়ে এলো।

সুবল জ্যাঠাকে বলতে লাগলো সেই মানুষটির কথা। কখনও তিনি জাতিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন, কখনও শাসক ইংরেজের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। এইভাবে মঞ্চে স্বামীজী এসেছেন দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে। ক্ষেত্রীর মহারাজার সভায়, লাহোরে গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসের মতিলাল দাসের সঙ্গে, আবার ঢাকায় স্বাধীনতা সৈনিক হেমচন্দ্রকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরার কথাও তাঁকে বলতে দেখি। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ওপর স্বামীজীর প্রভাব যে কত সুদূরপ্রসারী ছিল তা নাট্যকার অপূর্ব ভঙ্গিতে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তেমনি বিদেশে ধনকুবের রকফেলারকে সমাজচিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতেও আমরা দেখি।

নাটকটির উপস্থাপনা মনকে নাড়া দেয়। নাটকের অন্তে দেখি সুবল বলছে, স্বামীজীকে আমরা সত্যিই কি উপলব্ধি করেছি? সে স্বামীজীর রূপ ধরে গ্রামে গ্রামে ছুটে বেড়াবে— সাধারণ মানুষকে সে স্বামীজীর কথা শোনাবে। তাঁর ভারতচিন্তাকে সুবল মানুষের সামনে তুলে ধরবে। পরিচালক প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত প্রারম্ভে ও মাঝে মাঝে কোরাস (ভক্তবৃন্দ)-এর ব্যবহারে নাটকে এক অন্য মাত্রা এনেছেন। ‘বান এসেছে মরা গাঙে’ গানটির সঙ্গে নাচের কোরিওগ্রাফী সুপ্রযুক্ত। পরিচালক নিজে সুবল বৈরাগ্যের ভূমিকায় বেশ সাবলীল অভিনয় করেছেন। জ্যাঠামশায়ের ভূমিকায় রবীন চৌধুরীও সুন্দর। স্বামীজীর ভূমিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ে স্বামীজীর চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায় প্রমিতা চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক কর্মকার, প্রতীম বসাক, বাসুদেব মিত্র, অমর কুণ্ডু, সৌম্য পাল, ঋষি গুপ্ত প্রমুখ যথাযথ। বিপ্লবী হেমচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ণব হালদার স্বল্প অবকাশে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন। আলো, মঞ্চ ও আবহে যথাক্রমে জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচারু দাস ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকের দাবি মিটিয়েছেন। রূপসজ্জায় শক্তি ঘোষকে আরও একটু বাস্তব সচেতন হতে হবে।

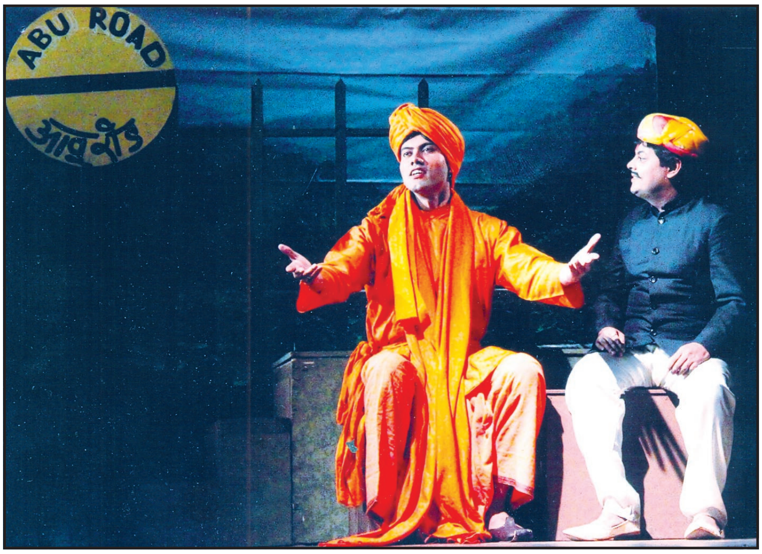

থিয়েটার কমিউনের ‘জাগ্রত বিবেক’-এর একটি দৃশ্য।

পরিশেষে একটা কথা না বলে পারছি না। একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে একটি নাট্যদলকে প্রভূত পরিশ্রম, অর্থব্যয় করতে হয়। বিনিময়ে তাঁরা কি একটু দর্শকানুকূল্য পেতে পারেন না? সেদিন বিরাট মধুসূদন মঞ্চে সামান্য কজন দর্শককে দেখে এই কথাই মনে হলো।

শব্দরূপ-৬৫৪ কণিকা মল্লিক

১		■	২		৩		■
	■	■		■		■	■
৪	৫			■		■	■
■		■	■	৬		৭	■
■	৮	৯		■	■		■
■	■		■	১০			১১
■	■		■		■	■	
■	১২				■	১৩	

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. বিশেষণে অতি সুন্দর, শ্রেষ্ঠ, ২. ভোজরাজের এই কন্যা জাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন, ৪. পদ্মফুল, বারো অক্ষরযুক্ত সংস্কৃত ছন্দবিশেষ, ৬. গোরুর ঘর, ৮. ফারসি শব্দে বাতি, শেষ দুয়ে ক্রোধ, ১০. নাম কীর্তন বা জপ, প্রথম দুয়ে বিষ্ণু, ১২. সরস্বতীদেবী, শেষ দুয়ে রৌপ্য, ১৩. ময়ূরের ডাক।

উপর-নীচ : ১. মহর্ষি উদ্দালকের কন্যা, একে তিনে তন্তু, ২. অব্যয়ে কপালজোরে, ৩. বিশেষণে অতীন্দ্রিয় ও ঐশ্বরিক বিষয় সম্বন্ধীয়, প্রথম দুয়ে নশ্বর, ৫. সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম নক্ষত্র, ৭. সুন্দরী নারী, ৯. রামানন্দ প্রবর্তিত সম্প্রদায়বিশেষ, ১০. নদীতে হঠাৎ যে বান আসে, শেষ ঘরে চরণ, ১১. বেলফুল।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫১
সঠিক উত্তরদাতা
অক্ষয় দে
দমদম, কলকাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

খ	গ	ম	■	জ	য়	দ্র	থ
ল	■	ধু	র্জ	টি	■	■	■
■	গো	প	■	লা	খ	বা	ন
■	ব	■	■	■	■	র	■
■	র্ধ	■	■	■	■	বে	■
ধ	ন	প	তি	■	কা	লা	■
■	■	■	জে	ঠা	মি	■	বী
ত	লা	ত	ল	■	নী	বা	র

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৫৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায়

Baijnath Shreelal

-: Mfgs. of :-
Handloom Silk,
Furnishing Cloth and
Cotton Dress
Materials

Head Office
Nathnagar, Bhagalpur (Bihar)
Tel. - 0641-2500437

Branch Office
193/1, Mahatma Gandhi Road
Kolkata - 700 007, Phone : 2270 0834
E-mail : bajopm@detaone.in

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে বস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড
বাঙ্গুর বিল্ডিং
সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৬

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

আত্মরক্ষায় ক্যারাটে, জুডো অন্ধ্রের পাঠ্যক্রমে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ দেশজুড়ে মেয়েদের উপর আক্রমণ উত্তরোত্তর যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে রাস্তা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোথাও মেয়েরা নিরাপদ নয়। দিল্লী ধর্ষণকাণ্ড তা আরও প্রকট করে তুলেছে। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে গোটা দেশে। নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ প্রশাসনও। তাই আর পুলিশ-প্রশাসনের উপর ভরসা নয়। মেয়েরা যাতে নিজেরাই আক্রমণকারীদের প্রতিহত করতে পারে নতুন বছরের শুরুতে সেই কথাই ভাবছে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার। আত্মরক্ষার জন্য স্কুল কলেজে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে মেয়েদেরকে ক্যারাটে, জুডোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার। রাজ্যের আবাসন মন্ত্রী পি সবিতা ইন্দ্রা রেড্ডী আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই অষ্টম শ্রেণী তদূর্ধ্ব ছাত্রীদের মধ্যে এই প্রশিক্ষণ চালু করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন— খেলাধূলা ও শারীরিক শিক্ষার মতো এই প্রশিক্ষণও পাঠক্রমে থাকলে মেয়েদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরা অপরাধের শিকার হলেও মুখ বুজে তা সহ্য করে যায়। কোনও অভিযোগ দায়ের করে না। সেক্ষেত্রে ১০০, ১০৮, ১০৯১ এই হেল্পলাইনগুলি কার্যকর করা দরকার যাতে ছিনতাই বা যৌন হেনস্থার শিকার হলে মেয়েরা সহজেই তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারে। সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে অন্ধ্রের এক উচ্চ পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন— 'রাজ্যে মেয়েদের উপর অত্যাচার বিগত বছরের তুলনায় সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।' বিশেষভাবে দায়িত্ব দিয়ে স্কুল কলেজে এই প্রশিক্ষণ চালু হলে মেয়েদের সুরক্ষা অনেকটাই নিশ্চিত করা যাবে বলে রেড্ডী মনে করেন। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীরও সম্মতি আছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

অন্ধ্রের উচ্চশিক্ষা দপ্তর ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কলেজে প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে এবং কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে আগাম সতর্কতাও জারি করেছে। তৎপর হয়ে উঠেছে অন্ধ্র পুলিশও, তারাও ছোট ছোট কয়েকটি বিশেষ দলে ভাগ হয়ে বাসস্ট্যান্ড ও কলেজগুলিতে নজরদারি চালাচ্ছে। অপরাধীদের ফাঁদে ফেলার জন্য নানা পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছে। সরকারের সদিচ্ছা ও প্রশাসনের তৎপরতায় মহিলাদের সুরক্ষার এই পরিকল্পনা অনেকটা ফলপ্রসূ হবে বলে অনেকে মনে করছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান